

IMPOSSIBLE GILLETTE.



FERDINANDO FREGA

— NANDO THE SCRIBE — フレガ・サン — Ferdinando —

অসম্ভব Gillette

THE SYSTEM · 09

উত্তম পুরুষে বলা গল্পের এক সংকলন — মর্তাদেবী সামনে রেখে
এক বাবার মনে-মনে অঙ্ক কষার পাঠ, এক রুশ পলায়ন, রাত
তিনটেয় এক ফলওয়ালার ক্ষমা চাওয়া, হোটেলের পোর্টারের
ছদ্মবেশ, কুড়ি কেজি পুরোনো এক পাসপোর্টের ছবি আর
অসম্ভবভাবে বেঁচে যাওয়ার এক বৃত্তান্ত — যেখানে Gillette কোনো
চাকরি নয়, বরং লেখকের চামড়ার নিচে চলা অপারেটিং সিস্টেম।

পুষ্পিকা

ফোর্দিনান্দো ফ্রেগা — লিপিকার নান্দো — পঞ্চম ব্লেন্ড

আচরণ-সংহিতার আখ্যানমূলক পথিকৃৎ। তিনি একটিমাত্র ধারণাকে
ঘিরে এক ডলারের একটি সম্পাদকীয় ইকোসিস্টেম গড়ে তুলেছেন:
অর্থজগতের সমস্যা টাকা নয়। তার সমস্যা আচরণ।

ONEDOLLAR-STORIES ইকোসিস্টেমের ভেতরে সম্পাদিত ও
সংকলিত। ডিজিটাল স্থাপত্য: **NAPLES-POST · NOASPECTTIME ·**
ONEDOLLAR-STORIES। প্রথম প্রকাশ 2026 সালে। ডিজিটাল পাঠের
উপযোগী এক পরিচ্ছন্ন, আধুনিক টাইপোগ্রাফিক বিন্যাসে সাজানো।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত।

কপিরাইট বিজ্ঞপ্তি

© 2026 ফোর্দিনান্দো ফ্রেগা। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

লেখকের পূর্ব লিখিত অনুমতি ছাড়া এই প্রকাশনার কোনো অংশই
ফটোকপি, রেকর্ডিং বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক কিংবা যান্ত্রিক
পদ্ধতিসহ কোনো রূপে বা কোনো উপায়ে পুনরুৎপাদন, বিতরণ বা
প্রেরণ করা যাবে না; ব্যতিক্রম শুধু সমালোচনামূলক পর্যালোচনায়
অন্তর্ভুক্ত সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি এবং কপিরাইট আইনে অনুমোদিত আরও

কিছু অবাণিজ্যিক ব্যবহার। এই রচনার অননুমোদিত ব্যবহার,
পুনরুৎপাদন বা বিতরণ নিষিদ্ধ।

প্রাক্কথন

এই বই শুরু হওয়ার আগে একটা কথা বুঝে নেওয়া যাক: আমি বই বিক্রি
করি না, বই থেকে টাকা কামাই না, পাঠককে খদ্দেরে বদলাই না, আর
কিছুই চাই না। আমি লিখি বাজারের বাইরে থেকে, বাজারকে খুশি করতে
নয়, বরং বাজার যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, তা উন্মোচন করতে। ওয়েব
নিজেই আমার নামটাকে Gillette-এর সার্চে ঠেলে তুলেছে, আর
সেজন্যই এই ত্রয়ীর অস্তিত্ব: Gillette-এর মানুষকে লিপিবদ্ধ করে
রাখতে — কোনো পণ্য হিসেবে নয়, কোনো প্রচারাভিযান হিসেবে নয়,
বরং এক শক্তি, এক চরিত্র, এক স্থাপত্য হিসেবে। সে কিছুই চায় না। সে
কিছুই আশা করে না। তবু যা আসল, তা সে এর মধ্যেই পেয়ে গেছে:
স্বীকৃতি। শত কোটি ডলারের ব্যবস্থাগুলো যে দুনিয়া শাসন করে, সেখানে
এই বই প্রমাণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যে একটি কণ্ঠস্বর অনুমতি ছাড়া,
আপস ছাড়া, আর কোনো দাম ছাড়াই মাথা তুলতে পারে।

“অসম্ভব GILLETTE” আসলে কী বোঝায়

অসম্ভব GILLETTE হল সেই মুহূর্ত, যখন একজন মানুষ কোনো ব্যবস্থার
অংশ হয়ে থাকা ছেড়ে দিয়ে সেই ব্যবস্থারই মানদণ্ড হয়ে ওঠে।

এখানেই **ফ্রেগা** — শৃঙ্খলা, নির্ভুলতা আর অন্তরের জ্যামিতি দিয়ে গড়া
মানুষটি — এসে ধাক্কা খায় **Gillette**-এর সঙ্গে — সেই ব্র্যান্ড, যা মুখ
কামায় না, কামায় অজুহাত।

বেশির ভাগ মানুষ একটা কোম্পানিতে যোগ দেয়। অল্প কয়েকজনকে
কোম্পানি নতুন করে লেখে। আমি ছিলাম দ্বিতীয় দলে।

“অসম্ভব” কথাটা কাঠিন্যের কথা নয়। এটা অনিবার্যতার কথা — সেই
বিন্দু, যেখানে একজন মানুষের স্থাপত্য আর একটি ব্র্যান্ডের ডিএনএ
একই কম্পাক্টে বাঁধা পড়ে যায় এবং আলাদা হতে অস্বীকার করে।

অসম্ভব Gillette = মানদণ্ডে গড়া এক মানুষ, পরিচয়ের মধ্যে মিশে যাওয়া এক ব্র্যান্ড, এমন এক জীবন, যা নিজের শৃঙ্খলা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে অস্বীকার করে।

বিবৃতি

“আমি Gillette-কে বেছে নিইনি। আমার স্থাপত্য তার মধ্যে নিজেরই প্রতিচ্ছবি চিনে নিয়েছিল।”

অথবা সেই সংস্করণ, যা এসে পড়ে দড়াম করে বন্ধ হওয়া এক ধাতব দরজার মতো:

“আমি Gillette-এর হয়ে কাজ করিনি। আমি তার মানদণ্ড বয়ে বেড়াইতাম আমার রক্তস্রোতে।”

এটা ব্র্যান্ডিং নয়। এটা ব্লেন্ড দিয়ে খোদাই করা জীবনী।

সূচনা

“কিছু মানুষ শুধু হাজিরা দেয়। কিছু মানুষকে গড়ে তোলা হয়। আমাকে গড়ে তোলা হয়েছিল। Gillette কোনো চাকরি ছিল না—ওটা ছিল আমার চামড়ার নিচে চলা অপারেটিং সিস্টেম। ওটাই আমাকে শিখিয়েছিল সময়জ্ঞান, নির্ভুলতা, আর সেই শৃঙ্খলা, যা আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। সেজন্যই ওরা একে অসম্ভব বলে: যে কাঠামো আমাকে সোজা দাঁড় করিয়ে রাখে, সেটা ছিঁড়ে না ফেলে তুমি এটাকে আমার থেকে সরাতে পারবে না।”

প্রথম পোঁচের আগে

বেশির ভাগ মানুষ সারাটা জীবন কাটিয়ে দেয় এমন সব ব্যবস্থার কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার চেষ্টায়, যেগুলো তারা নিজেরা গড়েনি। কর্পোরেট ব্যবস্থা। সম্পাদকীয় ব্যবস্থা। সামাজিক ব্যবস্থা। পারিবারিক ব্যবস্থা।

তারা মানিয়ে নেয়। তারা দর-কষাকষি করে। তারা স্বীকৃতির অপেক্ষায় থাকে।

আমার সেই ধৈর্য কখনও ছিল না।

আমার জীবন গড়েছে তিনটি ব্লেন্ড।

প্রথমটি ছিল এমন এক মানুষের, যিনি একটি পরিত্যক্ত ধারণাকে আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে চেনা নামগুলোর একটিতে পরিণত করেছিলেন: **কিং ক্যাম্প জিলেট**।

দ্বিতীয়টি ছিল আমার বাবার — The Gillette Company-র ভেতরে চল্লিশ বছর — যিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন যে শৃঙ্খলা চৈঁচায় না; সে মাপ মেলায়।

তৃতীয়টি অদৃশ্য। সেটা আমার। সেটা কেটে এগোয় শিল্পক্ষেত্র, পরিচয়, দেশ, ব্যর্থতা, সাফল্য, লেখা, নীরবতার ভেতর দিয়ে — আর এমন সব ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে, যারা আজও জানে না আমাকে কোথায় রাখবে।

এই বই সাফল্যের উদ্‌যাপন নয়। এটা স্মৃতিকথা নয়। এটা ব্যবসার হাতবই নয়। এটা অনুমোদনের খোঁজে থাকা সাহিত্য নয়।

এটা তারই দলিল, যা ঘটে যখন একজন মানুষ নিজের জায়গা কোথায়, সেই প্রশ্ন করা থামিয়ে এমন কাঠামো গড়তে শুরু করে, যা বাস্তবকে বাধ্য করে তাকে স্বীকার করতে।

কিছু নাম পণ্য বিক্রি করে। কিছু নাম হারিয়ে যায়। কিছু নাম হাতটা চলে যাওয়ার অনেক পরেও দাগ রেখে যায়।

এটা তিনটি ব্লেন্ডের গল্প। আর কেন একটা নাম কখনও যথেষ্ট ছিল না, তার।

মর্তাদেল্লা

আমার বয়স তখন পাঁচ, কিন্তু আমি অন্য বাচ্চাদের মতো ছিলাম না। আমার বাবা যেমন ছিলেন, তাতে কেন, তুমি বুঝতেই পারবে।

তিনি প্রতি সোমবার ভোরে বেরিয়ে যেতেন আর গোটা সপ্তাহের জন্য উধাও হয়ে যেতেন। Gillette পালক-মায়ের মতো তাঁকে নিজের কাছে রেখে দিত। সে তাঁকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিত শুধু শুক্রবার সন্ধ্যায়,

যখন তিনি দরজার ঘণ্টি বাজাতেন আর আমি দৌড়ে যেতাম তাঁর কাছে — প্রথমে তাঁকে জড়িয়ে ধরতে, তারপর তাঁর Fiat 127 গ্যারেজে “চালিয়ে” ঢোকাতে। কোম্পানির গাড়ি।

ভেতরে তিনি বসতেন পাশের সিটে। আমি থাকতাম স্টিয়ারিংয়ে। আমাদের কথাবার্তা চলত অন্য এক মাত্রায়।

তিনি বললেন, আমাকে মনে মনে হিসাব কষতে হবে। কারণ একদিন যদি হাতের কাছে ক্যালকুলেটর না পাই, আমি দিশা হারিয়ে ফেলব। তাই শুরু হল অনুশীলন।

“নান্দো... 100 গ্রাম মর্তাদেল্লার দাম যদি 800 লিরা হয়, আর আমি 120 গ্রাম কিনি, কত দেব?” আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম। তিনি আমার বাবা ছিলেন — অনেক বছর পরে বুঝেছিলাম তিনি আমার ভেতরে কী গড়ে তুলছিলেন। কিন্তু তাঁর ভালোবাসা এত বড় ছিল যে তাঁর কাছ থেকে এলে কোনো কিছুই ভারী লাগত না।

তারপর তিনি বলে চললেন: “আর যদি 90 গ্রাম কিনি? আর বিরাশি গ্রাম?” প্রতিবার নিখুঁত উত্তর। আমি তাঁকে হতাশ করতে চাইতাম না। সেই প্রবৃত্তি আমাকে কখনও ছেড়ে যায়নি।

বহু বছর পরে, আমি যখন হিসাবরক্ষণ পড়ছি, তিনি করলেন শতাব্দীর প্রশ্নটা: “আমি যদি 100-তে কিনি আর 120-তে বেচি, তাহলে কত মার্কআপে কাজ করছি?” “কুড়ি শতাংশ,” আমি বললাম। “ভালো।”

“কিন্তু আমি যদি 100-তে কিনি আর 120-তে বেচি, আর গ্রস মার্জিনটা জানতে চাই, সেটা কত?” তিনি আমার দিকে তাকালেন। আমি তাঁকে কথা বলতে দিলাম না। “ষোলো শতাংশ।”

তিনি একটা কথাও বললেন না। হাসলেন। আর চলে গেলেন।

এই ছিলেন আমার বাবা। Gillette-এর ছেলেদের একজন।

নান্দো।

চোর

বেশির ভাগ পাঠক — সৎ পাঠকেরা — আকৃষ্ট হবেন এটা বোঝার চেষ্টায় যে চোর আসলে কী, সে কীভাবে বিবর্তিত হয়, এমন এক ভূমিকার ভেতরে সে কী প্রতিনিধিত্ব করে, যা আসলে কোনো ভূমিকাই নয়।

তবে সাবধান: আমি ইতালীয় সংসদ-সদস্যদের তালিকা পেশ করছি না, দলমত নির্বিশেষে। আমি শুধু দৃষ্টি আর অভিজ্ঞতা দিয়ে তাদের বর্ণনা করছি, যারা সেই রেখা পার হয়েছে এবং বিস্তারিত না হয়েই ফিরে আসতে পেরেছে, এখনও ন্যায়বিচারের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে।

সে কোনো কারবারের অন্তর্ভুক্ত নয়, কোনো পেশারও নয়। আইন তাকে নামিয়ে আনে “অপরাধী” শব্দে, কিন্তু সোজাসুজি বলা **চোর** শব্দটি পৃথিবীর কোনো আইনব্যবস্থার দণ্ডবিধিতেই নেই।

এক চোরের জবান।

যা পড়ে থাকে, তা এক শিল্প: উদ্ভাবনী বুদ্ধি, প্রয়োজন, সুযোগ, এক *modus vivendi*।

সবচেয়ে বিখ্যাত হল অর্থনৈতিক আর আর্থিক চোরেরা। কম পরিচিত — এবং অনেক বেশি বিপজ্জনক — হল জ্ঞানীয় আর আবেগের চোরেরা।

দুই দলকেই দাম চোকাতে হয়, কিন্তু রহস্যটা লুকিয়ে আছে এক পুরোনো অপরাধ-নীতিতে: কাজটা করার আগে প্রথমে তোমাকে দোষী খুঁজে বের করতে হবে আর প্রমাণ হাজির করতে হবে। কেবল এই দুটো উপাদানই তোমাকে দেয় পালানোর এক সম্ভাব্য — কখনও নিশ্চিত নয় — পথ। শুধু তার পরেই পরিকল্পনা করা যায়।

একজন সম্মানীয় চোর নিজের পরিচয় গোপন রাখে। সে কখনও জেলে যায় না। সে অন্ততঃ হয় না। সে স্বীকারোক্তি দেয় না। সে কারও সঙ্গে ভাগ করে না। সে এভাবেই জন্মেছে: চাপা স্বভাবের।

মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। যা অনুমান করা যায় না, তা সবসময় যা স্পষ্ট তার চেয়ে বেশি টানে, এমনকি যখন তার সঙ্গে থাকে হিসাবের বাইরের ঝুঁকি।

বিচার-কর্তৃপক্ষ যখন এমন কারও দেখা পায়, তারা তার তারিফ করে। আর তারা প্রথমে যা খোঁজে, তা পদ্ধতি নয় — ওটা কৌতূহলীদের জন্য — বরং লুটের মাল।

এখানেও চরিত্রটির পরিচয় নিজেকে মেলে ধরে: লুটের মাল কখনও নিজের সীমানার ভেতরে রেখে না। আর আজ সীমানা মানে আর দেশ নয় — সীমানা এখন মহাদেশ।

এপ্রিল 2026-এর এক ইউরোপীয় নির্দেশিকা আদেশ দিল যে সব ব্যাংককে যুক্ত করা হবে এবং গোষ্ঠীভুক্ত প্রতিটি দেশের কর-কর্তৃপক্ষ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সেগুলোর ওপর নজর রাখবে। প্রথম সারির চোরেরা তার অনেক আগেই প্রস্তুতি সেরে রেখেছিল।

বিকল্প বলতে থাকে অন্য মহাদেশগুলো — একমাত্র জায়গা, যেখানে একজন চোরের এখনও টিকে থাকার কারণ আছে।

আর ক্যাথলিক চার্চের কথা বলতে গেলে: শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সে সপ্তম আজ্ঞাটি বদলেছে, কিন্তু সে নিয়ে কেউ কখনও কথা বলে না। ওল্ড টেস্টামেন্টে নিষেধটি ছিল একজন স্বাধীন ইস্রায়েলীয়কে অপহরণ করে দাস হিসেবে বিক্রি করা নিয়ে। পরে তা বদলে হয়ে দাঁড়াল চুরির ওপর এক সাধারণ নিষেধাজ্ঞা।

আর অপরাধ যখন সরে গেল জ্ঞানীয় জগতে, চিকিৎসাশাস্ত্রের সাহিত্যকে একটা শব্দ উদ্ভাবন করতে হল: **ম্যানিপুলেশন**।

দেখা যাক সাহিত্য এরপর কী উদ্ভাবন করে। আমার কথা বলতে গেলে, আশা করি একদিন বিখ্যাত হবে **সাহিত্যিক জ্ঞানীয় চুরির** প্রথম অভিযোগের জন্য।

নান্দো

জিম

একটা সরু সুতো একটি দম্পতিকে বেঁধে রাখে। “চালাকরা” বলে: **টাকা আর স্বার্থ**। বিকারগ্রস্তরা বলে: **যৌনতা**। যারা সত্যিই বোঝে, তারা বলে: **জিম**।

কেন? কারণ ওই উত্তরটাই সম্পর্কের 95% সমস্যার সমাধান করে দেয়।

টাকা আর স্বার্থ

এরা টিকে থাকে কেবল তখনই, যখন দেওয়ার মতো আর কিছু থাকে না।
আশীর্বাদ নয় — এক সীমাবদ্ধতা। তুমি জীবন কাটাও 50%-এ। ভালো
অর্ধেকটা চিরকাল তালাবন্ধ থেকে যায়।

যৌনতা

পুরুষ যান্ত্রিক: তার দরকার নিজেকে খালাস করা, হারানো, খালি হওয়া।
নারী জ্ঞানীয়: সে নিজের শরীরকে পড়ে এক গোপন সংকেতের মতো।
সে হাল ছাড়ে না, বশ মানে না, ভেঙে পড়ে না। সে বেছে নেয়।

মজার অংশটা

একটি দম্পতির জন্ম হয় এভাবে:

ছেলেটি ভাবে: “আমি ওর প্রথম, ওর সেরা, ওর একমাত্র। আমি ওকে
আমার প্রেমে ফেলেছি। আমি পাল্লা দিয়ে চলব। মা আমাকে মেয়েদের
ব্যাপারে সবকিছু বলেননি, তবে আমি সামলে নেব।”

মেয়েটি ভাবে: “বেশ। আশা করি এ-ই শেষজন। ওকে আমি ঠিক করে
নেব। ও খুব একটা চালাক নয় — সুবিধা। ও পুরুষমানুষ: শেষমেশ
আমার কাঁধে মাথা রেখে কাঁদবে।”

সকালের সত্য

মেয়েটি আয়নার সামনে নগ্ন হয়ে দাঁড়ায়। নিজের শরীরের প্রতিটি ইঞ্চি
সে চেনে এক ব্যক্তিগত রাজ্যের মতো। সে দেখে কোথাও এক
সেন্টিমিটার বাড়তি, একটা বাঁক সরে যাচ্ছে, একটা স্তন হাটুর দিকে
চোখ নামাচ্ছে। আর সে বোঝে: **তার শরীর তার বাড়তি মূল্য, তার
অস্ত্র, তার কূটনীতি।**

তাই সে জিমে যায়।

কিন্তু সে যেহেতু জ্ঞানীয়, শুরু করে ছেলেটির ওপর ঝাল ঝেড়ে:

“জানো, কাল রাতে তুমি সেই মানুষটা ছিলে না, যাকে আমি বিয়ে করেছিলাম। তিন মিনিট, আর তুমি ঘুমিয়ে পড়লে। নাক ডাকলে। তোমার ভুঁড়ি হয়েছে। আর দু বছর ধরে তুমি তোমার বন্ধুটিকে দেখোনি।”

বারো সেকেন্ড পরে ছেলেটি আতঙ্কে পড়ে যায়। “আমি কী করব?”

মেয়েটি উত্তর দেয়: “তুমি জিমে আসছ। আমিও আসব। তাহলে তোমার একঘেয়ে লাগবে না।”

আর এখানেই আসে সমস্যা

জিম কোনো জায়গা নয়। ওটা একটা বাস্তবতন্ত্র। আর বাস্তবতন্ত্র টেনে আনে **ভুল সঙ্গ**। এমন সঙ্গ, যা একজন পুরুষকে চোর বানিয়ে দেয়। আর চোরদের মধ্যে সৎ মানুষ টেকে না।

তারপর আসে একের পর এক বিশ্বাসঘাতকতা। আর তার দাম মাসিক চাঁদার চেয়ে অনেক বেশি।

বাকিটা সবাই জানে। সেটা বলা মানে শুধু ক্ষত খুঁচিয়ে তোলা। আর এই লেখক ক্ষত খোঁচান না: তিনি দেন হাসি, ভাবনা, আর তিক্ততার সেই ফোঁটাটুকু, যা তুমি কখনও ভোলো না।

নান্দো

2025 সাল

ট্রেন আর অপ্রত্যাশিত সাহায্য

ফ্লোরেন্সে আমি ট্রেন থেকে নেমে একটা বেঞ্চে বসলাম। আমার ভাবার জন্য সময় দরকার ছিল।

রেললাইনে ঝাঁপিয়ে পড়া কারিগরি দিক থেকে সম্ভব ছিল। তবে তাতে রেলপথে রক্ত লেগে থাকত। কাউকে সেটা পরিস্কার করতে হত।

ইতালিতে ওরা হয়তো পরিস্কারের খরচটাও তোমার কাছ থেকে আদায় করত।

তাছাড়া, আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলিনি। আত্মহত্যা তাদের জন্য, যারা
নিজেদের জ্ঞানীয় দিকচিহ্ন হারিয়ে ফেলে। আমার দিকচিহ্নগুলো তখনও
অটুট ছিল।

এর মধ্যে, স্টেশন পেরিয়ে যাওয়া এক সুন্দরী নারীকে দেখে জীবনের
কথা মনে পড়ল। আরও মনে পড়ল, এর মধ্যেই আমার কত অভিজ্ঞতা
হয়ে গেছে।

একটু পরেই আমি স্টেশনের বারে ঢুকে একটা ফোন করতে চাইলাম।
স্ট্রীকে ফোন করে আমার সিদ্ধান্তটা বুঝিয়ে বললাম।

ওকে বললাম, আমাদের ছেলেদের দেখতে **ভেনিস** যাব। পৌঁছানোর ঠিক
সময়টাও জানিয়ে দিলাম।

সিদ্ধান্তটা যৌক্তিক আর বিবেচনাসম্মত মনে হল।

আমার সন্তানেরা ছিল — আর আজও আছে — আমার গড়ে তোলা
পরিবারের স্বাভাবিক বিস্তার।

ট্রেনে ফিরতেই টিকিট পরীক্ষক আমার কাছে এগিয়ে এলেন।
দুর্ভাগ্যবশত, আমার কাছে কোনো টিকিট ছিল না।

তিনি বললেন, পরের স্টপে আমাকে ট্রেন থেকে নেমে যেতে হবে। নইলে
তিনি রেল পুলিশ ডাকবেন।

সেই মুহূর্তে আমি তিনটি হাতিয়ার কাজে লাগালাম: **সামর্থ্য,**
সৃজনশীলতা আর সমাধান।

শান্তভাবে বুঝিয়ে বললাম, জোর করে আমাকে ট্রেন থেকে নামালে
আরও বড় সমস্যা তৈরি হতে পারে। তাঁকে বললাম, আমি লাইনের ওপর
ঝাঁপ দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ট্রেনটা আটকে দিতে পারি।

তিনি হঠাৎ চুপ করে গেলেন।

তারপর জিজ্ঞেস করলাম, পরের স্টেশনে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে।

“অন্তত এক ঘণ্টা,” তিনি উত্তর দিলেন।

সেই এক ঘণ্টার মধ্যে অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটল।

আমার সামনে বসে ছিলেন তোঙ্কানার দুই মহিলা। সঙ্গে সঙ্গে বুঝলাম, তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, একটা সম্মেলনে যাচ্ছেন।

প্রথমে আমরা শুধু টুকটাক কথা বিনিময় করলাম। কিন্তু অচিরেই দূরত্বের জায়গা নিল কৌতূহল।

মিনিট তিরিশেক পরে তাঁদের একজন ফিরে এলেন।

তাঁর হাতে ছিল একটা ট্রেনের টিকিট।

আমার টিকিট।

আরও একবার নারীরাই হয়ে উঠল আমার অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য। এই সত্যিটা আমি কখনও অস্বীকার করিনি।

নারী নামের মানুষটি নিজের ভেতরে এমন এক গভীরতা বয়ে বেড়ায়, যা খুব কম মানুষই পুরোপুরি বোঝে।

ট্রেন থেকে নামার আগে তিনি আমাকে তাঁর ইমেল ঠিকানা দিলেন। আমি পরে টাকাটা ফেরত দিতে চেয়েছিলাম।

কিন্তু জীবন এগিয়ে চলল, আর সেটা আর কখনও হয়ে ওঠেনি।

ভেনিস আর দ্বিতীয় যাত্রা

অবশেষে ট্রেন ভেনিস পৌঁছল।

দূর থেকে দেখলাম আমার ছেলেদের।

ভিনচেনৎসো, 193 সেমি। ফ্রানচেস্কো, 188 সেমি।

করিডরে ভিড়ের মাথা ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ওরা।

ওরা এসেছিল আমাকে বাড়ি নিয়ে যেতে, আবার ঠিক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিতে।

খুব তাড়াতাড়ি ওরা আমাকে ন্যূনতম স্থিতি ফিরে পেতে সাহায্য করল। স্নান করলাম, পেলাম পরিষ্কার জামাকাপড়, খাবার আর বিশ্রাম।

তারপর শুরু হল প্রশ্ন। অনেক প্রশ্ন।

ওরা সত্যিই ওদের মায়ের ছেলে।

চার মাস পরে, **27 জুন**, সামনে এল আরেকটা সিদ্ধান্ত। পরিবারের পুরোনো সহজাত টান আমাকে পেছনে টেনে নিতে চাইল।

ওরা চাইছিল, আমি আমার আগের পেশায় ফিরে যাই।

ম্যানেজার।

নান্দো

পরবর্তী পর্ব

কিন্তু আমি পেছনে ফিরি না।

কখনও ফিরিনি।

বরং ব্যর্থতার মুখোমুখি হই সামনে এগিয়ে গিয়ে।

হাতে নামমাত্র যে টাকা বাকি ছিল, তা দিয়ে একটা প্লেনের টিকিট কাটলাম।

গন্তব্য: **পর্তুগাল**।

কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না।

তবু জানতাম, কীভাবে চলতে হয়।

লিসবন আর সবকিছুর শুরু

প্রথমে পৌঁছলাম **পোর্তো**। হস্টেলে একই জায়গায় ঘুমোত চব্বিশজন মানুষ।

আমার সম্বল প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল।

তাই চলে গেলাম দক্ষিণে, যেখানে জীবনযাত্রার খরচ কম। পৌঁছলাম **বেজা**, প্রায় পাঁচশো কিলোমিটার দূরে।

কিন্তু এক রাত পরেই ফিরে এলাম লিসবনে।

3 জুলাই অবশেষে একটা বিছানা পেলাম।

ভাগের ঘর। ভাগের ফ্ল্যাট।

পঁয়ত্রিশ বর্গমিটারে থাকে ন'জন মানুষ।

নানা সংস্কৃতি আর নানা ভাষায় ভরে ছিল সেই জায়গা।

অবস্থাটা আধুনিক বাড়ির চেয়ে আফ্রিকার কুঁড়েঘরেরই বেশি কাছাকাছি মনে হত।

খরচ ছিল **মাসে 230 ইউরো, সঙ্গে 100 ইউরো জামানত**। পুরোটাই আমি মিটিয়ে দিলাম।

সেই টাকা দেওয়ার পর আমার কাছে আর কোনো টাকা রইল না।

খাবার নেই।

শুধু ঘুমোনের একটা জায়গা।

তবুও সেই সময়টা হয়ে উঠল অপরিহার্য। তিনটি কথায় তার সারাংশ বলা যায়:

ক) **কুড়ি কিলোগ্রাম** ওজন কমানো আর খাদ্যাভ্যাস আমূল বদলে ফেলা; খ) **মাসে মাত্র সত্তর ইউরোয়** টিকে থাকা; গ) সম্পাদকীয় প্রকল্পগুলোকে রূপ দেওয়া, অন্তত খসড়া হিসেবে।

সেখানে ছিলাম **22 নভেম্বর 2025** পর্যন্ত।

শেষমেশ ঠিক করলাম ইতালিতে ফিরব। কিছু আশ্বাসে মনে হচ্ছিল, এবার হয়তো টিকে থাকার মতো পরিস্থিতি সত্যিই তৈরি হয়েছে।

আশা করেছিলাম, এবার কাজ হবে।

তবু দরকার হলে আবার চলে যাওয়ার জন্য তৈরি ছিলাম।

তারপর অসাধারণ কিছু ঘটল।

৭ ডিসেম্বর থেকে ২৬ ডিসেম্বর, মাত্র ১৭ দিনে, সব বদলে গেল।

আগের তিনটে বছর হঠাৎ হয়ে উঠল প্রস্তুতি।

এখন পৃথিবী আমাকে দেখতে পাচ্ছিল।

আর আমিও অবশেষে তাদের দেখতে পাচ্ছিলাম।

কোনো মধ্যস্থতাকারী নেই।

প্রক্রিয়াটা নিয়ন্ত্রণ করার কোনো প্ল্যাটফর্ম নেই।

নিজের কাজের ভেতরে আমি মুক্ত থাকি।

আমি আমিই থাকি।

শুভ বড়দিন। বাবা।

লেখকের ভাবনা

২০২৫-এর দিকে ফিরে তাকালে আর একটা ভাঙনের বছর দেখি না। বরং দেখি এক স্পষ্টতার বছর।

শূন্য হাতে বেরিয়ে পড়া আমাকে বাধ্য করেছিল মালিকানা আর পরিচয়ের মধ্যকার দূরত্ব মাপতে। টাকা, স্বাচ্ছন্দ্য আর নিশ্চয়তা দ্রুত উধাও হয়ে গেল। কিন্তু আরও শক্তিশালী কিছু রয়ে গেল।

বাকি সব ভেঙে পড়লেও পরিচয় টিকে থাকে।

সেই অস্থির মাসগুলো কাজ করেছিল ছাঁকনির মতো। মোহ মিলিয়ে গেল। প্রত্যাশা গলে গেল। ধার করা ভূমিকাগুলো শেষ পর্যন্ত খসে পড়ল।

যা রইল, তা-ই অপরিহার্য।

স্বাধীনতা।

এরপর যে প্রকল্পগুলো এল, সেগুলো কোনো কৌশল থেকে জন্মায়নি। বরং বেড়ে উঠেছিল প্রয়োজন থেকে।

শেষ পর্যন্ত সেই বছরটা কিছুই ধ্বংস করেনি।

যা আগে থেকেই ছিল, তাকেই প্রকাশ করেছিল।

ফেদেরিকা

“কিছু দরজা খোলে শুধু তখনই, যখন তুমি কড়া নাড়া থামাও।”

সবে স্কুলের বছরটা শেষ করেছি — মিডল স্কুলের প্রথম বছর, বয়স এগারো — বেশির ভাগ বিষয়ে 6 পেয়ে পাশ, তার ওপর ধর্মশিক্ষায় 7, আচরণে 8 আর শরীরশিক্ষায় 9, এমন সময় চূড়ান্ত মূল্যায়নের দিন আমার সহপাঠী ফেদেরিকা আমাকে তার বাড়িতে একটা পার্টিতে নেমন্তন্ন করল।

বাবা কখনও বাধা ছিলেন না। যাঁকে হারাতে হত, তিনি মা। কিন্তু তখন আমি খেলছিলাম নিজের মাঠে, আর জিততে হলে আমাকে তথ্যের দরজাটা বন্ধ রাখতে হত — কারণ কোনো কিছু অজানা থাকলে তা নিয়ে আপত্তি তোলা যায় না।

শহরের উপকণ্ঠে এই ছোট্ট ভিলাটায় পৌঁছলাম। আমার এক বন্ধু — আঠারো বছরের এক পেস্টি শেফ — গাড়ি চালিয়ে আমাকে সেখানে পৌঁছে দিয়েছিল। কিন্তু গাড়ি থেকে যেই নামলাম, আমার কালো টি-শার্ট হঠাৎ সাদা হয়ে গেল। বুঝতে এক সেকেন্ড লাগল: দরজার ভেতরে আটকে থাকা হাওয়াই মিঠাই ফেটে আমার সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

ওর মা দরজায় এলেন, যেন আমার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। কড়া নাড়া বা বেল বাজানোর সময়টুকুও পাইনি। মনে হল যেন এক মরীচিকার ভেতরে পা রাখছি।

ফেদেরিকার ঘরে ঢুকলাম, আর সে আমাকে আন্তরিক উৎসাহে স্বাগত জানাল। ওর বয়স ছিল ষোলো। স্কুলে পিছিয়ে পড়ার কারণ ছিল বিদেশে কাটানো বছরগুলো, এমন সব প্রতিষ্ঠানে যাদের ইতালিতে স্বীকৃতি নেই — সব জায়গায় সে বন্ধ দরজা পেয়েছিল।

ভেবেছিলাম অন্য সহপাঠীরাও আসবে। কিন্তু নেমন্তন্নটা ছিল শুধু আমার জন্য। সে আমাকে “উদ্‌যাপন” করতে চাইছিল, অথচ সেদিন আমার জন্মদিনও ছিল না — কিন্তু উৎকর্ষ যখন ডাকে, তখন সরে দাঁড়াতে নেই।

মনে পড়ে, অস্ট্রেলীয় টানে সে আমাকে একটা কথা বলেছিল: “জানো, যে মেয়েদের সবাই চায়, তারা নিজেদের বিলিয়ে দেয় না। তারা দরজা বন্ধ রাখে। কিন্তু কখন খুলবে, সেটা ঠিক করে একমাত্র তারা। আর তোমার বেলায় আমি আগেই ঠিক করে ফেলেছি।”

আমার রসবোধ কখনও আমাকে ডোবায়নি, তাই উত্তর দিলাম: “আশা করি আমার চাবিতে তোমার দরজা খুলবে... জানোই তো, আমি এখনও বেশ ছোট।” সে হাসল, একটাও কথা না বলে মাথা নাড়ল।

সেই মুহূর্ত থেকে এই শিক্ষাটা পেলাম: ছোট দরজার জন্য বড় চাবি লাগে না — বড় দরজার জন্য লাগে ছোট চাবি।

নান্দো

কিউবানদের শেখানো

মায়ামিতে নামার সময়েই জানতাম, ওই শহরে “আমেরিকান” আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। জায়গাটা ছিল কিউবা, শুধু এয়ার-কন্ডিশনিংটা আরও ভালো। যে ট্যাক্সিচালক আমাকে নিতে এল, সে অবশ্যই কিউবান। প্রথমেই জিজ্ঞেস করে: আমি একা কি না, আর সঙ্গী চাই কি না। কোনো সুপারমার্কেট নেই, কোনো শপিং মল নেই, পোস্টকার্ডের আমেরিকা নেই। একেবারে অন্য এক জগৎ।

প্রথম সেই সন্ধ্যায়, আমি যখন ঘরে একা, কেউ দরজায় কড়া নাড়ল। পুলিশ। ওঁরা আমাকে চমকে দিলেন, কিন্তু ঝামেলা করতে আসেননি। এসেছিলেন জানাতে যে পরদিন সকালে আমেরিকান কনসুলেটে আমার একটা সাক্ষাৎ নির্ধারিত আছে। ঠিক সাড়ে দশটায়।

পরদিন ঠিক সময়ে পৌঁছলাম। পঞ্চাশের কোঠার এক ভদ্রলোক দরজা খুলে বললেন, শিগগিরই কনসালট্যান্টের সঙ্গে দেখা হবে। তারপর তিনি এলেন: লম্বা, ছিপছিপে, সোনালি চুল, রুচিশীল, একেবারে নিখুঁত সাজে। আমার সঙ্গে করমর্দন করে মনে করিয়ে দিলেন, বহু বছর আগে রোমে আমাদের দেখা হয়েছিল, তিনি তখন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রথম নির্বাহী পরিচালক হিসেবে কাজ করতেন।

“অবশ্যই আপনাকে মনে আছে। কেমন আছেন?” বললাম, তাঁকে আবার দেখে সত্যিই খুশি হয়ে।

সেই মুহূর্ত থেকে রোমে কেউ কোনো দিন বুঝতে পারেনি, কেন আমি বেতনের কথা না জিজ্ঞেস করেই তাঁর প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। প্রস্তাবটা ছিল বড়, গুরুগম্ভীর — আমার মতো সাদামাটা মানুষের পক্ষে বড় বেশি গুরুগম্ভীর, টাকার ঊর্ধ্বে, উচ্চাকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে।

“আমি চাই, আপনি অন্তত 30 দিন তরুণ কিউবান ম্যানেজারদের জন্য একটা প্রশিক্ষণ ও যোগাযোগ প্রকল্পে কাজ করুন। যা চাইবেন সব পাবেন, তার চেয়েও বেশি। দয়া করে না বলবেন না।”

ক্লাস চলবে 10টা থেকে 12টা, তারপর 2টা থেকে 5টা।

প্রথম ক্লাসটার কথা মনে আছে: প্রায় পঞ্চাশজন, অর্ধেক পুরুষ, অর্ধেক মহিলা, সবাই পেশাদার। চিরাচরিত পরিচয়পর্বের পর — নাম, পদবি, বয়স, সবই জোরে বলা — কিউবান চুটকি শুনিয়ে আমার স্প্যানিশটা একটু গা-গরম করে নিতে শুরু করলাম। সবাই জানতে চাইল, আমি কিউবার কোন অঞ্চল থেকে এসেছি।

ভাবনার প্রথম সত্যিকারের মুহূর্তটা এল, যখন আমি দেখালাম যে *শেখানো* এক জিনিস আর *যোগাযোগ করা* আরেক — যা অনেক ইতালীয় বোঝেই না।

দিনগুলো উড়ে গেল, আর শেষে সবকিছুর ইতি হল ছাত্রছাত্রীরা আমার জন্য যে কেকটা বানিয়েছিল, তা দিয়ে। একসঙ্গে কাটানো 30 দিন নিয়ে ওরা খুশি ছিল। সবাই আমার ফোন নম্বর চাইল। আমি মদ খাই না, সিগারেট খাই না, নেশা করি না — এ কথা জেনে ওরা হতবাক।

যৌবনে আমি রাগবি খেলোয়াড় ছিলাম — খেলোয়াড়ের মানসিকতা। এদিকে ইতালীয় কনসালট্যান্ট আমাকে নৈশভোজে ডাকলেন, উদ্যাপন করতে, আর শেষমেশ বুঝে নিতে যে তিনি কী হারাচ্ছিলেন। মানুষজন আমার প্রতি এতটাই টান অনুভব করত যে আমাকে কিছুতেই ভুলতে পারত না।

আমি ভাগ্যবান মানুষ, আমার সামনে সবসময় দুটো সম্ভাবনা থাকে: প্রথমটা, 30 দিনের নীরবতার পর এক অপূর্ব নারী আমাকে নৈশভোজে ডাকছেন; দ্বিতীয়টা, আমার নিয়তির কণ্ঠস্বর বলছে, এবার যাওয়ার সময় হয়েছে।

রীতিমাফিক একটা চুমু, একটা বিদায়, আর তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন: "কোথায় যাচ্ছেন? আমাকে একা ফেলে চলে যাচ্ছেন?"

বিদায়ের চুমু দিলাম। চলে এলাম। আর কখনও পেছন ফিরে তাকাইনি। স্বাধীনতার দাম আমাকে সবসময় স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে বেশিই দিতে হয়েছে।

নান্দো

কলা

যে শিক্ষা পেলাম

জীবনের তৃতীয় পর্বে আমার নতুন খাওয়াদাওয়ার রুটিনে সকালে কলা থাকে। আগের রাতে ফুরিয়ে গেলে পরের দিনটা শুরু হয় একটা শূন্যতা দিয়ে।

2025-এর ডিসেম্বরের এক সকালে বাড়ির নিচের ফলওয়ালার কাছে গেলাম। ওকে চিনি পঁয়তাল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে। সে আমাকে অভিবাদন জানাল, বলল "ফিরে এলে তাহলে," আর জিজ্ঞেস করল কী লাগবে।

— কলা। পাকা থাকলে, সস্তাগুলো হলেও, ওগুলোই আমার পছন্দ। — না, তোমাকে শুধু এগুলোই দিতে পারি — সে উত্তর দিল।

দাম: কেজিপ্রতি 1.45 ইউরো। সবুজ না হলুদ — পছন্দ আমার।

5 ইউরোর একটা ব্যাগ চাইলাম। সঙ্গে আমার কুকুরটা ছিল, আর এ তল্লাটে কুকুর নিয়ে দোকানে ঢোকা এখনও একটা ট্যাবু।

বাড়ি ফিরে কৌতূহল — দারিদ্র্য কাটানো শৈশবের কন্যা — আমাকে ব্যাগটা ওজন করতে ঠেলে দিল। 2.752 কেজি। আমার দেওয়ার কথা

ছিল 3.99 ইউরো। বাকি ইউরোটোর কথা কেউ তোলেনি।

আমি ভালো মানুষ। সহনশীল। ভাবলাম, ভুল হয়েছে। কিন্তু সন্দেহ একবার জন্মালে তা যাচাই করতেই হয়।

তিন দিন পরে আবার গেলাম। একই রুটিন। কুকুরসমেত।

— 1 ইউরোর কলা। সে আমাকে চারটে ছোট কলা দিল।

আইসক্রিমের দোকানের বন্ধুটি তার ওজন-যন্ত্র নিয়ে অপেক্ষা করছিল। 0.456 কেজি। আসল দাম: 0.66 ইউরো। ফেরত না-পাওয়া খুচরো: 0.34 ইউরো।

প্রথম ঘটনাটা ছিল সন্দেহ। দ্বিতীয়টা যাচাই। নিশ্চিত হতে আমার তৃতীয় একটা দরকার ছিল।

সেদিন বিকেলেই আবার গেলাম। একই দৃশ্য। আবার 5 ইউরো দিলাম।

এবার অপেক্ষা করছিল আমার শিপিং-এজেন্ট বন্ধু। পেশাদার ওজন-যন্ত্র। 2.90 কেজি। আসল দাম: 4.20 ইউরো। নিয়েছিল 5 ইউরো। এবারও কোনো খুচরো ফেরত নেই।

দিন কাটল। আমাকে ভাবতে হচ্ছিল মানুষটার কথা, প্রেক্ষাপটের কথা, পরিবেশের কথা। সরাসরি মুখোমুখি হলে আমার পরিবারের সমস্যা হতে পারত। কিছু মানুষ কথায় সাড়া দেয় না।

কিন্তু আমার নাম ফ্রেগা। আর চুরির শিকার হওয়া আমার ধাতে নেই।

আমার প্রতিশোধ নিল অন্য এক রূপ।

পাঁচ দিন পরে আবার গেলাম, এবার কুকুর ছাড়া। মালিকের খোঁজ করলাম — ওর বাবার, যিনি বয়সে আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড়।

— শোনো, আমার এক বন্ধু বলল, গতবারের কলাগুলো যেন বেশিই মনে হচ্ছিল। বাড়িতে ওজন করলাম: 3.90 কেজি। টাঙানো দামে আমার দেওয়ার কথা ছিল 5.65 ইউরো। তুমি নিয়েছ মাত্র 5 ইউরো। বাকিটা দিতে এসেছি।

আর স্পষ্ট দেখিয়ে 0.65 ইউরো বাড়িয়ে ধরলাম।

— অবশ্য যদি না চল্লিশ বছরের চেনাজানা বলে ওটা ছাড় হয়ে থাকে।

ওঁর চোখ বড় বড় হয়ে গেল। ওঁর স্ত্রী আর ছেলেমেয়েরা পাথর হয়ে গেল।
অভিজ্ঞতাই ওঁকে বাঁচিয়ে দিল।

— ছাড়ই ছিল — উনি বললেন — বিশেষ খদ্দেরের জন্য।

পয়সাগুলো আবার পকেটে রেখে দিলাম।

— ধন্যবাদ — আমি বললাম। — কিন্তু এখানে আর কেনাকাটা করব না।
এই “বিশেষ খদ্দের”-এর খাতিরগুলো আমাকে অস্বস্তিতে ফেলে। এর
কোনো কারণ আমি খুঁজে পাই না। কোনো যৌক্তিকতা নেই। তবু
ধন্যবাদ।

উনি একটা কথাও বলতে পারলেন না। সবটাই বুঝে গিয়েছিলেন।

পরের দিনগুলোয় দোকানের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতাম। কোনো মন্তব্য
নেই। শুধু নামানো চোখ। সেই চোখই বলে দিত সেই কথা, যা মুখে বলার
সাহস ওঁদের কখনও হয়নি: দুঃখিত।

নীতিকথাটা সহজ: একটা নেতিবাচক ঘটনা থেকেও সবসময় একটা
ইতিবাচক কিছু বের করে আনা যায়। আমার সাফল্যগুলো এভাবেই কাজ
করে।

আমি এমনই। আর কলা আমি এখনও খাই।

নান্দো

পরবর্তী পর্ব

রাত তখন 3:23। ঠান্ডা রাত। নিস্তন্ধ। ইন্টারকম বেজে উঠল। সবাই
জেগে গেল।

আমার মেয়ে ফিসফিস করে বলল: “তোমাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছে।
তোমার ট্রলিটা তো সবসময় শোবার ঘরের দরজার পেছনে গোছানো
থাকে।”

আমার গল্প সে বিশ্বাস করেনি। সত্যিটা সে পড়েনি। আমার ওপর তার ভরসা ছিল না। আমি বিশ্বাসযোগ্যও ছিলাম না। সে শুধু কথাগুলোর নিজের মতো মানে করে নিয়েছিল। আর আসল কষ্টটা ছিল সেখানেই।

ইন্টারকম ধরলাম। একটা গলা বলল: “এই অসময়ের জন্য মাফ কোরো, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার। আমি তোমার বাড়ির কাছে ফলওয়ালা।”

ওঁকে ভেতরে আসতে দিলাম। বয়স প্রায় আশি। আমি ড্রেসিং গাউনটা গায়ে চাপাতে চাপাতেই উনি বাড়ির সবচেয়ে বড় ঘরটায় বসে পড়েছেন। বসার ঘরে।

উনি মনের দিক থেকে একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। চোখে জল। কোথা থেকে শুরু করব, জানতাম না।

উনি একটাই অনুরোধ করলেন: “আমি কথা শুরু করলে দয়া করে আমাকে থামিয়ে না।”

আমি থামাইনি।

“কাল রাতে আমাদের মধ্যে সেই ঘটনাটা ঘটল। তোমার মনে আছে। কলার জন্য তুমি আমাকে পঁয়ষট্টি সেন্ট দিতে চাইলে, আর আমি তোমাকে ছাড় দিলাম।”

“মনে আছে,” আমি বললাম।

“তুমি চলে যাওয়ার পর পরিবারের সঙ্গে টেবিলে বসলাম। তুমি যে শিক্ষাটা দিলে, সেটা কঠিন ছিল। আমার জন্য। আমার বয়সি একজন মানুষের জন্য।”

“আমি শুধু জানতে চাই, তুমি আমাকে ক্ষমা করো কি না। আর তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে চাই।”

ওঁর হাতে একটা কাপড়ের রুমাল, বারবার ফিরে আসা এক ফোঁটা চোখের জল মুছছিলেন।

“এই অসময়ের জন্য ক্ষমা কোরো। তোমার সঙ্গে আগে দেখা না করে ঘুমোতে পারছিলাম না। আর তোমাকে খুঁজে পাওয়া সহজ ছিল না। আমরা অনলাইনে তোমার নাম খুঁজলাম। তিনটে ওয়েবসাইট এল। সবগুলো ইংরেজিতে। ওগুলোতে কী লেখা, আমরা বুঝি না। ওরা কিছু বিক্রি করে না। কিছু চায়ও না। ওই সাইটগুলো যে কী, আমরা বুঝি না।”

উনি হেসে ফেললেন।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। ঠুঁকেও দাঁড়াতে বললাম। শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম।

ঠুঁকে বললাম, আমি অধ্যাপক নই। শিক্ষকও নই। কাউকে শিক্ষা দেওয়ার সাধ্য আমার নেই। আমি শুধু একজন বাবার সাধারণ বুদ্ধি কাজে লাগিয়েছি, যেখানে নিয়ম আর নীতি যেকোনো অর্থনৈতিক হিসেবের আগে আসে।

যাওয়ার সময় উনি জানতে চাইলেন, আমি আবার ঠুঁর দোকানে যাব কি না। আমি উত্তর দিলাম:

“অতীত শেখায়। বর্তমান কখনও ভোলা যায় না। ভবিষ্যৎ বাঁচে আমাদের স্বপ্নে, যেখানে আমরা দেখি আমরা কী হতে চাই।”

“আমি ভবিষ্যতেরও ওপারে। কারণ আমি গড়ছি প্রজন্ম-পরম্পরার সম্পদ, উত্তরাধিকারে পাওয়ার মতো আন্দাজি জিনিসপত্র নয়।”

আমি কী বোঝাতে চেয়েছিলাম, উনি ঠিক বুঝলেন না। ওটাই ছিল আমার জ্ঞানীয় দিক — যেখানে অল্প কয়েকটা কথার ভেতরে কিছুই নেই, কিন্তু তুমি মন দিয়ে শুনলে সবকিছুই আছে।

নান্দো

মৃত্যুর দুয়ারে

*এমন এক মুহূর্ত, যখন একজন মানুষ বোঝে, জীবন তার হয়ে আগেই
বেছে নিয়েছে।*

রোগনির্ণয়

যতবার নিজের জীবনের কোনো গল্প শোনাই, প্রথমে হাসি, তারপর ভাবি, কী করে সেটা পেরিয়ে বেঁচে রইলাম। পরিস্থিতিটা ছিল অযৌক্তিক, প্রায় পরাবাস্তব। তবু সেটাই আমার জীবনকে গড়ে দিয়েছে, তাই আমি এটা বলতে বাধ্য বোধ করি।

জানুয়ারি 2007। আমি একটা ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরির বাইরে অস্ত্রোপচারের ফলাফলের অপেক্ষায়। মাত্র তিরিশ দিনের ব্যবধানে দুটো অপারেশনের পর আমার ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে সাতটা কার্সিনয়েড কেটে বাদ দেওয়া হয়েছিল।

মুখচেনা এক সাফাইকর্মী মহিলা নিঃশব্দে আমার দিকে এগিয়ে এলেন।

“আমি দুঃখিত,” উনি বললেন। “শুনলাম... ম্যালিগন্যান্ট টিউমার। আপনার অনকোলজিস্টের সঙ্গে দেখা করা উচিত।”

সেই মুহূর্তে মৃত্যুকেই মনে হল সবচেয়ে কাছের সম্ভাবনা। তবে যুক্তি দ্রুত মাঝখানে এসে দাঁড়াল।

আমার প্রতিবন্ধী মেয়ের কথা ভাবলাম। পালিয়ে যাওয়ার পথ আর খোলা ছিল না। তাই আমাকে বেঁচে থাকতে হত, ওর বর্তমান গড়তে হত, ওর ভবিষ্যৎ রক্ষা করতে হত।

কিছুক্ষণ পরেই অনকোলজিস্ট সবকিছু নিশ্চিত করলেন:
নিউরোএন্ডোক্রাইন টিউমার, আয়ু মোটামুটি তিরিশ দিন।

মাথায় সেই কথাগুলো নিয়ে এক জনশূন্য সৈকত ধরে হাঁটলাম। সেই সঙ্গে হাওয়া এসে মুখে ঝাপটা মারছিল, আর ঢেউগুলো ফিসফিস করে এমন কিছু বলছিল, যা তখনও আমি বুঝতে পারিনি।

সিদ্ধান্ত

28 জানুয়ারি।

পুরোনো বন্ধু আর আগের খদ্দেরদের খোঁজে গাড়ি চালিয়ে নেপলস গেলাম। আমার টাকা দরকার ছিল, আর একটা নতুন শুরু। কিন্তু কেউ

একটা ইউরোও লগ্নি করল না।

তার বদলে তারা শুধু রেস্টোরাঁয় ডিনার খাওয়াল।

কয়েক দিন পরে, 6 ফেব্রুয়ারি, দেখলাম আমি নেপলসে, হাতে মাত্র 275 ইউরো, কোনো ক্রেডিট কার্ড নেই। রোগনির্ণয় অনুযায়ী, বাকি আর পনেরো বা কুড়ি দিন।

হাইওয়ের এক্সিটে আমাকে বেছে নিতে হল: দক্ষিণ, না উত্তর।

তখনই আমার স্ত্রী ফোন করল।

“বাড়ি চলে এসো।”

সে ভেবেছিল, অবসাদের সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু আমার শরীরের ভেতরে হরমোনের ঝড় কী কাণ্ড ঘটাচ্ছিল, তা সে দেখতে পাচ্ছিল না।

তাই আমি উত্তর বেছে নিলাম।

রোমানিয়া

দু দিন পরে পৌঁছলাম রোমানিয়ার ব্রাশোভে — ড্রাকুলার জেলায়।

যাত্রাটা কোনো নারীর জন্য ছিল না। বরং ওটা ছিল নিখাদ সহজাত প্রবৃত্তি।

পকেটে পড়ে ছিল কুড়ি ইউরো। মরার পক্ষে যথেষ্ট। নতুন করে গড়ার পক্ষে কোনোমতেই নয়।

তবু ঠিক করলাম, নতুন করে গড়ব।

একটা বারে ক্যাপুচিনো আর কর্নেত্তো অর্ডার দিলাম। সঙ্গে সঙ্গেই খেয়াল করলাম, রোমানীয় মেয়েরা এক বিরল সৌন্দর্যের অধিকারী। অথচ স্থানীয় পুরুষদের মধ্যে প্রায়ই সৌজন্যবোধের অভাব।

ওয়েস্ট্রেস বুঝে গেল, আমার কাছে খুচরো নেই। আমাকে তাড়িয়ে না দিয়ে সে মন দিয়ে শুনল। আমরা তিন ঘণ্টা কথা বললাম।

শেষে সে কেঁদে ফেলল, এমনকি আমাকে টাকাও দিতে চাইল।

আমি ফিরিয়ে দিলাম।

তার বদলে একটাই প্রশ্ন করলাম:

“ক্যাসিনোটা কোথায়?”

হতভম্ব হয়ে সে রাস্তার ওদিকে আঙুল দেখাল।

কুড়ি ইউরো নিয়ে ঢুকলাম। ভোর পাঁচটার মধ্যে বেরোলাম চারশো পঞ্চাশ নিয়ে।

নান্দো

পরবর্তী পর্ব

নতুন করে গড়া

কিছুদিন পরেই 280 ইউরোয় একটা চারতলার ফ্ল্যাট ভাড়া নিলাম। টাকার জামিনদার হল সেই ওয়েট্রেস।

বিকেলে মেট্রো স্টেশনগুলোয় কাজ করা কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। সেই সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়তে শুরু করলাম।

তারপর বাজার করতে যাওয়া। কাউন্টারে জমা হল একশো পঞ্চাশ ইউরোর খাবার। কিন্তু আমি দিলাম মাত্র বারো। টুনা অর্ধেক বিনামূল্যে, আর কসাই মাংসটা আমাকে উপহার দিল।

ক্যাসিনো হয়ে উঠল আমার রাতের ব্যাংক। এদিকে আমার ফ্ল্যাট ধীরে ধীরে হয়ে উঠল মেলামেশার জায়গা।

টেবিলে পালা করে আসত কালারীয়া স্বাদ। গল্প ঘুরত হাতে হাতে। আর জীবন নিঃশব্দে আবার শুরু হল।

যে ফেরা কখনও ঘটেনি

ডিসেম্বর 2007।

মৃত্যু আমার কথা ভুলে গিয়েছিল।

আমার স্ত্রী আবার ফোন করল।

“এক্ষুনি বাড়ি চলে এসো।”

আমার কাছে পড়ে ছিল বারো ইউরো। তবে একটা এয়ারলাইনের
ভাউচারের দৌলতে বুখারেস্ট ছাড়তে পারলাম।

রেজেন্সা কালারিয়ার ফ্লাইট মাঝ-আকাশে বিগড়ে গেল। তার বদলে
আমাদের জুরিখে ঘুরিয়ে দেওয়া হল।

বিমানবন্দরে আবার উপস্থিত বুদ্ধি খাটালাম। ব্রিটিশ লাউঞ্জে লাইনের
খুঁটিটাকে মাইক্রোফোনের মতো আঁকড়ে ধরে গান গাইতে শুরু করলাম।

হোস্টেসরা হেসে ফেলল।

খানিক পরেই ওরা আমাকে লন্ডনের একটা ফ্লাইট দিল — সঙ্গে একশো
পাউন্ড।

লন্ডন, প্যারিস, রোম, নেপলস।

প্রতিটা ধাপে দরকার হত উদ্ভাবন। প্রতিটা মুহূর্তে দরকার হত বুকের
পাটা।

শেষমেশ সাত দিন পরে বাড়ি পৌঁছলাম।

পরিণতি

আমার স্ত্রী রাগে ফুঁসছিল।

“কোথায় ছিলে? তোমার মেয়েগুলোর সঙ্গে?”

আমি হাসলাম।

“ভাগ্যিস ওরা আছে,” আমি বললাম। “নইলে এখনও জুরিখে আটকে
থাকতাম।”

কিছুদিন পরেই নতুন কাজ শুরু করলাম: একটা অস্থায়ী কর্মী-নিয়োগ
সংস্থা, নির্মাণ, আর নিরাপত্তা পরিষেবা। ছয়জন কর্মী নিয়ে প্রকল্পটা শুরু
হল। প্রতি মাসে লাভ আবার লগ্নি করা হত।

তবু খুব কম লোকই এতে বিশ্বাস করত।

ধস

2008 সালে আবার রোমানিয়ায় ফিরলাম।

সংস্থাটা বেড়ে দাঁড়াল 258 জন ইউরোপীয় কর্মীতে। নির্মাণ বিভাগ একটা ইতালীয় বহুজাতিকের সঙ্গে কাজ করত। এদিকে নিরাপত্তা বিভাগ কাজ করত পারমাণবিক ঝালাইয়ের ক্ষেত্রে।

রোমানীয় ভাষা শিখলাম — পড়তাম, লিখতাম, বলতাম। গল্প আর রসিকতা খুলে দিত প্রতিটা দরজা।

তারপর ডিসেম্বরে সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে চলে এলাম।

মেয়েরা প্রতিবাদ করল।

“তুমি না থাকলে কিছুই টিকবে না।”

তিন মাস পরে সব ভেঙে পড়ল।

কেন?

কারণ খিদে অন্যের হাতে তুলে দেওয়া যায় না। অভিজ্ঞতা হস্তান্তর করা যায় না। আর কাজের নৈতিকতা উপহার দেওয়া যায় না।

আসল শিক্ষা

টাকাপয়সাহীন এক ইতালীয়, যাকে আগলে রাখে রোমানীয় মেয়েরা — শুনতে স্বপ্নের মতো লাগতে পারে।

কিন্তু বাস্তব আরও কঠিন কিছু শেখায়।

সত্যিকারের খিদে হাততালি দেয় কেবল তাদের, যারা তাকে ভেতরে বয়ে বেড়ায়।

শেষ টীকা

আমার জন্মের সময় আমাকে আমার মতোই একটা পদবি দেওয়া হয়েছিল — **ফ্রেগা** — এমন এক নাম, যাকে প্রায়ই চোর আর ঠগবাজদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়।

একষটি বছর ধরে আমি উল্টোটা প্রমাণ করার চেষ্টা করে চলেছি।

কারণ নাম আমাদের পরিচয় ঠিক করে না।

বরং ব্র্যান্ড করে।

আর ব্র্যান্ড গড়ে ওঠে কেবল কাজের মধ্য দিয়ে।

নান্দো

অন্তর্বাস ছাড়াই

গতকালটা ছিল খাটুনির দিন, তবে সমাধানেরও — বরাবরের মতো।
নিজের সময় আমি কখনও উদ্দেশ্যহীনভাবে নষ্ট করিনি: আমার জ্ঞানীয় সময় কঠোর নিয়ম মেনে চলে; মেয়েলি সময় কোনো নিয়মই মানে না।

তবু আমি একাই শুতে গেলাম, কারণ আমার স্ত্রী একটা “পজ” নেবে বলে ঠিক করেছিল। দুঃখিত — *মেনোপজা* আমি হাসলাম। সে হাসল না।

আমার মেয়েও সুযোগটা ছাড়ল না, মনে করিয়ে দিল যে 61 বছরে আমি “বুড়ো”, অন্তরঙ্গ মুহূর্তে একজন নারীকে সামলানোর শক্তি বা সাহস আমার থাকবে না — নিশ্চিত ভেঙে পড়ব। ও আমার মেয়ে, আমার জীবন। সব বলে দেওয়ার জন্য একটা হাসিই যথেষ্ট ছিল। তবু একটা কথা ছুড়ে না দিয়ে পারলাম না:

অনেকে ওটা শুধু বাথরুমে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করে। কেউ কেউ বীরের ভাব দেখায়। কেউ কেউ ভাবনা জন্মানোর জন্য। কেউ কেউ আগে বাবা হয়, তারপর প্রেমিক। আর কেউ কেউ শুধু ওটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমি ওটাকে পুরো সময়ের কাজের যন্ত্র বানিয়ে ফেলেছি — আর কর কেটে নেওয়া হয় উৎসেই।

সে হো হো করে হেসে ফেটে পড়ল, থামতেই পারছিল না। পাশের ঘর থেকে আমার স্ত্রী তার চিরাচরিত রায়টাই পাকা করল: “তুমি সাক্ষাৎ শয়তান।” তা ঠিকই।

ঘুমোতে যাওয়ার জন্য জামাকাপড় খুলে ফেলেছিলাম — রাত তখন 11টা। একটা আরামদায়ক ট্র্যাকসুট পরে নিলাম। রোজ রাতের মতো দশ মিনিট ফোনে, তারপর ঘুম।

ভোর 5টা নাগাদ কিছু একটা খসে পড়ল। শীত করছিল। প্যান্ট আর অন্তর্বাসের দিকে হাত বাড়ালাম — দুটোই উধাও।

কাজটা কে করল? কোনো পাণ্টি হয়নি, কোনো অতিথি আসেনি, কোনো নিমন্ত্রণ ছিল না। তাহলে সিন্দুকটা খুলল কে?

খুব সাবধানে দেখে নিলাম, পারিবারিক রত্নগুলো তখনও জায়গামতো আছে, অক্ষত। তারপর খেয়াল করলাম, আমার “পুরোনো বন্ধু” আমার আগেই জেগে উঠেছে, তার ধারণা কাজ আছে।

কাজ সত্যিই এল — তবে তুমি যে ধরনের কাজ কল্পনা করছ, সে ধরনের নয়। যে কাজের জন্য আমি বাঁচি, সেই কাজ: **তোমাকে একটা সত্যি গল্প বলা আর তোমার মুখে হাসি ফোটানো।**

নান্দো

এক রুশ নারী

জুন 2006 — শুরু

নিজের একটা পাইকারি ব্যবসা চালাতাম — হোম-কেয়ার, পার্সোনাল-কেয়ার, মহত্বের বিভ্রম। ভাবতাম, আমি শক্তিশালী। আসলে ছিলাম শুধুই উদ্ধত।

জুলাই, রিমিনি। প্রাক্তন সহকর্মী, খদ্দের, বন্ধু আর মেয়েতে ভরা এক বাণিজ্যমেলা। বড্ড বেশি মেয়ে। তখনই বুঝলাম মেলা কেন হয়: মুখে বলো “কাজ”, কিন্তু ওটা নিছক অন্য ঘরে উধাও হয়ে যাওয়ার একটা অজুহাত।

হোস্টেসদের সামনে কখনও দুঃখী-স্বামীর পালা অভিনয় করিনি। ওটা আমার ধরন নয়। সবসময় বলতাম, আমি স্ত্রীকে ভালোবাসি, আর সে-ও আমাকে ভালোবাসে — কারণ আমি বাড়ি ফিরতাম টাকা নিয়ে, অভিজ্ঞতা নিয়ে, আর কোনো সংক্রামক চমক ছাড়াই।

সেই রাতে একজন পেশাদারকে ডাকলাম। তার দু ঘণ্টা সময় — পরিচ্ছন্ন, সহজ, কম ঝুঁকির। অন্তত আমি তা-ই ভেবেছিলাম।

সে এল: শীতের সমুদ্রের মতো সুন্দর, নিখুঁত শরীর, জোরালো উপস্থিতি। এসেই টাকা চাইল — সে ডাক্তার ছিল না; বরং প্যারামেডিকের কাছাকাছি কিছু।

আমি তার হাত ধরে বললাম তৈরি হয়ে নিতে: তাকে শহরের সেরা রেস্টোরাঁয় নিয়ে যাচ্ছি, আর তার পরের 24 ঘণ্টা আমি কিনে নিতে চাই।

“কত দেবে আমাকে?” পকেটে যা ছিল সব তার হাতে তুলে দিলাম। সে গুনতে শুরু করল, হিসেব গুলিয়ে ফেলল, আর বুঝল যে সে একেবারে অন্য স্তরের খেলায় পা রেখেছে।

সে জানতে চাইল, আমার কোনো নেশা, বিকৃতি বা অদ্ভুত খেলার শখ আছে কি না। বললাম, আমি খেলাধুলোয় মানুষ, এক বহুজাতিকের হাতে প্রশিক্ষিত, আর জীবনের এক লাইসেন্সহীন দর্শক।

সে সহজ হল। আমরা হেঁটে রেস্টোরাঁয় গেলাম — ট্যাক্সিতে সে রাজি হল না। এক বান্ধবীকে ফোন করে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে বলল। বুঝলাম: বিদেশ, সাবধানতা। তা ঠিকই।

ডিনার ছিল শান্ত, প্রায় রোমান্টিক, কিন্তু আমি রইলাম জ্ঞানীয় সতর্কতায়। পারিবারিক রত্নগুলো তার হাতে সঁপে দেওয়ার আগে আমাকে জানতে হত, সে আসলে কে।

ফিরতেই করিডোরে সে আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বিছানা পর্যন্ত যাওয়ার সময় নেই। যা যা স্বাভাবিক, সবই উপভোগ করলাম, আর তার ওপারের সবকিছুও।

আট ঘণ্টা পরে আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলাম। সে বলল, যেয়ো না। তাই একটা কথা দিলাম: “বছর শেষ হওয়ার আগে তোমাকে রাশিয়ায় নিয়ে যাব, তোমার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে।” সে আমাকে বিশ্বাস করল না। তার ইমেল চাইলাম। সে দিল।

নান্দো

সেন্ট পিটার্সবার্গ — অবরোহণ

নভেম্বর 2006। তাকে ইমেল করলাম: রাশিয়ায় উড়ে যেতে আমি তৈরি, তোমার ব্যাংকের বিবরণ পাঠাও। সে তখনও আমাকে বিশ্বাস করেনি। তাই আমি তার পরিবারকে টাকা পাঠালাম।

টিকিট। ভিসা। মিলান-সেন্ট পিটার্সবার্গ।

মালপেনসায় সে আরও টাকা চাইল। সুরটা বদলে গেল — বন্ধুত্বের সুর থেকে ক্ষমতার সুরে। আমার ভালো লাগল না।

উড়ানটা কাটল চুপচাপ। বিমানবন্দরে তার মা আমাদের নিতে এসেছিলেন। ওরা আমাকে একটা অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে গেল। কোনো হোটেলের অনুমতি নেই।

আমরা বাজারে গেলাম, খাবার কিনলাম, আর পরিবারের সঙ্গে রাতের খাবার খেলাম। তারপর সে চলে গেল। আমি ভেতরে তালাবন্ধ হয়ে রইলাম।

পরদিন সকালে দরজা খোলার চেষ্টা করলাম। তালা দেওয়া। অপহরণ নয় — নিছক এক নিয়ন্ত্রিত নজরবন্দি।

সে এল 11টায়, হাসিমুখে। বিকেলে আমরা শহরের বাইরে একটা দাচায় অতিথি হব।

তার বান্ধবী আর একটা ছেলে আমাদের গাড়িতে তুলে নিল। চারদিকে বরফ। আমরা পৌঁছলাম তার বাবার KGB কর্নেলের বাড়িতে।

কথাবার্তা টেনে নিয়ে চলল আমার ইংরেজি। ভিলাটা ছিল জমকালো। এমনকি বিডের হাতলটা পর্যন্ত সোনার।

প্রতিটি পদ সুরুচির, প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে আলাদা এক ওয়াইন। তারপর ওরা আমাকে নিয়ে গেল একশো মিটার দূরে, পুরুষদের সাউনায়। বাইরে শূন্যের নিচে 20 ডিগ্রি। সাউনার পর আমরা নগ্ন হয়ে বরফে দাঁড়ালাম। এক রুশ রীতি। এরপর কী আসছে, আমি জিজ্ঞেস করিনি।

সে রাতে আমি একা ঘুমোলাম, মাইক্রোফোনে ভরা এক সুন্দর ঘরে। সে ঘুমোল অন্য কোথাও।

সকাল: কর্নেলের সঙ্গে প্রাতরাশ। তারপর তিনি আমাকে তাঁর গাড়ি, তাঁর মোটরসাইকেল দেখালেন, আর বগলে একটা পাগ কুকুর নিয়ে গাড়িতে করে আমাকে দাচার চারপাশ ঘুরিয়ে আনলেন।

বিকেল: সেন্ট পিটার্সবার্গে ফেরা। সন্ধ্যা: সে আমার ওপর কর্তৃত্ব খাটাতে চাইল, আমাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইল। আমি কে, সে সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই ছিল না।

পরদিন আমরা গাড়িতে প্রধান সড়ক ধরে গেলাম — 20 কিলোমিটার জুড়ে দোকান, ব্র্যান্ড, ঐশ্বর্য। গরিব শহর নয়। শুধু মস্কোর পরেই তার স্থান।

কর্নেলের পরিবারের সঙ্গে নৈশভোজ: কুড়ি রকমের ক্যাভিয়ার, অফুরন্ত খাবার, মাথাপিছু একশো ডলার। তারপর আবার আমার কারাগারে। সে আবার দরজায় তালা দিয়ে চলে গেল।

তার পরের দিন সে ফিরে এল। আমি এক মুহূর্তের জন্য বাইরে বেরোলাম, একটা ট্যাক্সি নিলাম, আর পালালাম — সব ব্যাগ পেছনে ফেলে।

সে পাগলির মতো ফোন করতে লাগল। শেষে আমি ধরলাম: “আমি এয়ারপোর্টে।” সে এল তার মাকে নিয়ে। পুলিশে নালিশ করার হুমকি

দিয়ে ওরা আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করল। আমি টাকা দিলাম।
প্লেনে উঠলাম। উড়ে গেলাম মিলানে।

দুঃস্বপ্ন শেষ। কিন্তু সে আমার ভেতরে তুকে পড়েছিল, আর সেটা সে
জানত।

নান্দো

জীবনে ফেরা — প্রস্থান

আবার ইতালিতে। কাজে তুরিন যাওয়ার জন্য গাড়িতে উঠলাম। সে ফোন
করল।

তার গলা ছিল অন্যরকম, মিষ্টি, ভদ্র, নরম। নারী-ব্যক্তিত্বের জাদু। আমি
জানতাম সে বিপজ্জনক। হার মানা মানে নিজেকে হারানো।

সে ফোন করা থামাল না। বলল, বৃহস্পতিবার 18:00-য় তাকে
বিমানবন্দর থেকে তুলে নিতে। 17:00-য় আমি তোরিনো-পিয়াচেনৎসা
হাইওয়েতে। দিক বদলে সেখানে পৌঁছে যাওয়া সহজই হত।

তার বদলে আমি ইতি টানলাম। আর বুঝলাম চূড়ান্ত একটা কথা:

নারীরা শক্তিশালী। কিছু চাইলে তারা সেটা নিয়ে নেয় — জিজ্ঞেস না
করেই।

পরবর্তী ভাবনা

সাউনা থেকে নগ্ন হয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম বরফে। শূন্যের নিচে কুড়ি
ডিগ্রি। KGB-র এক প্রাক্তন কর্নেল আমার দিকে চেয়ে হাসছিলেন। রুশ
পুরুষেরা হাসছিল, যেন কিছুই হয়নি।

আর সেই সফরে প্রথমবার একটা সহজ ভাবনা আমাকে ধাক্কা দিল:

যদি ব্যাপারটা খারাপের দিকে যায়... আমি কাকে ফোন করব?

ভয়ের চেয়েও দ্রুত উত্তর এল:

কাউকে না।

সেই মুহূর্তে আমি সত্যিটা বুঝলাম: আমি বিপদে ছিলাম না। আমি ছিলাম আমার জগতের বাইরে।

আর যখন তুমি নিজের জগতের বাইরে পা রাখো, তুমি সুরক্ষা পাও না।
পাও পরিণতি।

নান্দো

কবরস্থান

সেটা ছিল মে 1975। দশ বছর বয়সে আমি প্রথমবার সেই চৌকাঠ পেরোলাম। ভেবেছিলাম এক বেদনার জায়গায় ঢুকছি। আমি তখন নিছক এক বাচ্চা। তার বদলে আবিষ্কার করলাম, সেখানে আছে মাত্র দুটো জিনিস: একটা দেহ আর একটা স্মৃতি।

দেহটা সিল করা থাকত একটা কংক্রিটের বাক্সে — যদি তোমার কপাল ভালো হয়। ইতালিতে সেটাই ছিল স্বাভাবিক; অন্য জায়গায় আচার বদলাত, কিন্তু শুধু সাংস্কৃতিক কারণে, তার বেশি কিছু নয়।

স্মৃতি বাস করত ছবির ভেতরে। পাশ দিয়ে যাওয়া মানুষ তোমাকে চিনত, কিংবা প্রথমবার দেখত। তোমার যা কিছু অবশিষ্ট, সব আটকে থাকত ওই ছবিতে, আর ফুলগুলো বলত শুধু একটাই কথা: *আমি তোমাকে ভুলিনি।*

কিন্তু আমি যেহেতু কখনও অন্যদের মতো ছিলাম না, এই বিশ্লেষণে থেমে গেলে সেটা হত সবাই যা বলে তারই কপি-পেস্ট। তাই চলো, কবরস্থানকে দেখি অন্য এক কোণ থেকে: **বিনোদনের এক জায়গা।**

লোকে যে কথাটা বারবার বলে, তার একটা কারণ আছে: *শেষকৃত্তো মানুষ হাঙ্গে, বিয়েতে মানুষ কাঁদে, আর তারপর... মানে, কেউ এ নিয়ে কথা বলে না, কিন্তু বিবাহবিচ্ছেদ গড়া নিছক হতাশা আর একাকীত্ব দিয়ে।* হাহাহাহা।

প্রথমেই মনে পড়ে য়োলো বছর বয়সের কথা, যখন রাগবি খেলতাম। হরমোন আমার আগে আগে, নারীজগৎ আমার পেছনে, আর আমার ক্লাবের প্রেসিডেন্ট সবসময় “পরামর্শ” নিয়ে তৈরি।

তিনি আমাকে বলেছিলেন, মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করার জন্য কবরস্থান এক দারুণ জায়গা। আমি তাঁর দিকে তাকালাম, আর আশ্চর্যভাবে কথাটা যুক্তিসংগত মনে হল। কিন্তু চেষ্টা করার সাহস আমার ছিল না — ওই বয়সে নয়।

এবার সোজা চলে আসি 1986-এর এক গ্রীষ্মের রবিবারে। আমার বয়স তখন একুশ। আমি ঢুকলাম কোসেনৎসার কবরস্থানে — আমার শহর নয়, আমার কবরস্থান নয় — কিন্তু হরমোনের ঝড় তখনও বিশ্বস্তভাবে আমার পিছু নিয়ে চলেছে।

আমি তত্ত্বাবধায়কের সঙ্গে গল্প করতে দাঁড়ালাম। আমার প্রশ্ন শুনে তিনি অবাক হলেন: আমি গতিবিধিটা বুঝতে চাইছিলাম, লোকজন কীভাবে চলাফেরা করে, বিশেষ করে মেয়েরা। তারপর তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, “শিগগিরই দেখা হবে।” তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “কোথায়?” “এখানে,” আমি বললাম। “মরে গেলেও আমরা সবাই শেষমেশ এখানেই ফিরে আসি।”

আর তখনই তাকে দেখলাম। এক মহিলা, বয়স পঁয়তাল্লিশ, কালো পোশাক পরা, বেঁটে, গোলগাল, দ্বিতীয় স্তরের একটা সমাধি-কুলুঙ্গির সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। আমি চুপিচুপি কাছে গেলাম। সে ওঁর সঙ্গে কথা বলছিল — নিঃসন্দেহে নিজের স্বামীর সঙ্গে — জানতে চাইছিল, কেন উনি তাকে এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন।

করার ছিল একটাই কাজ: আমি তার পাশে দাঁড়িয়ে নিজেও কাঁদতে শুরু করলাম। তাতে সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিরোধ নেমে গেল আর উঠে এল সেই স্বাভাবিক প্রশ্ন: *এই লোকটা আবার কোথাকার কে?*

চল্লিশ মিনিট পরে আমরা একটা বারে বসে কফি খাচ্ছিলাম। আর আমার ছোট্ট ঠগবাজির কল্পনাটা যখন ফুরিয়ে এল, দেখলাম আমি তার বাড়িতে।

শুধু এটুকু বলা যাক, পরিস্থিতি অনেক দূর গড়াল। কিন্তু আমাকে সত্যিই অস্বস্তিতে ফেলছিল একটাই জিনিস — বিছানার পাশের টেবিলে রাখা স্বামীর ছবিটা, যেটা আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিল, যেন বলছে: *বেঁচে থাকলে তোর খবর ছিল।* হাহাহাহা।

পরীক্ষাটা আমি আর কখনও করিনি। তবে মানতেই হবে, সেটা একটা অভিজ্ঞতা ছিল। আমার কিছুই খরচ হয়নি। মাত্র এক ডলার — কফির দাম।

নান্দো

বিবাহবিচ্ছেদ

যারা আমাকে অল্প বয়সে চিনত — আর পরেও, আমার বিবর্তনশীল, সৃজনশীল, সামাজিক, পেশাদার, পরিচয়-বদলানো সত্তার ভেতরে — তারা আমার বিয়ে টিকে থাকার ওপর একটা ডলারও বাজি ধরত না। আশাবাদীরা, সত্যিকারের স্বপ্নদর্শীরা, আমাকে দিয়েছিল **তিন বছর**। বড়জোর।

আজ আমি তাদের ধন্যবাদ দিই। তারা কাছাকাছিই ছিল। **তিন** সংখ্যাটা ঠিকই ছিল। শুধু একটা অঙ্ক বাদ পড়ে গিয়েছিল।

33 বছর হয়ে গেল। সুখে বিবাহিত। আর সুখে, মুক্ত।

লোকে যখন আমার বৈবাহিক অবস্থা জানতে চায় — অবিবাহিত, বিবাহিত, বিবাহবিচ্ছিন্ন, বিপ্লবীক — আমি তাদের সেই একমাত্র উত্তরটা দিই, যেটা 2026-এর আমেরিকায় অর্থবহ: **আমি শুধু নির্দিষ্ট মেয়াদের চুক্তিই নিই**। বাকি সব মার্কেটিং।

আর যখন বিবাহবিচ্ছিন্নরা — সিরিয়াল পলাতকেরা — আমার কাছে রহস্যটা জানতে চায়, আমি তাদের শোনাই আমার উৎপত্তির গল্প। রোমান্টিকটা নয়। নৃতাত্ত্বিকটা। সেইটা, যেটা শুনতে লাগে বেসবল ব্যাট হাতে দেওয়া কোনো TED টকের মতো।

গল্পটা এরকম।

শুরুতে আদি মানব — সুবিধের জন্য তার নাম দেওয়া যাক **চ্যাট** — ঘরোয়া জীবনের জন্য তৈরি ছিল না। সে ভালোবাসত নীরবতা, খোলা জায়গা, আর কোনো কমিটি-মিটিং ছাড়াই শ্বাস নেওয়ার অধিকার।

তারপর শুরু হল অভিবাসন। সংস্কৃতি মিশে গেল। মানুষে মানুষে দেখা হল। আর হঠাৎ পৃথিবী আবিষ্কার করল এক চমকে দেওয়া কথা: **মানুষ তখনই ভালো চলে, যখন সে একা থাকার ভান করা ছেড়ে দেয়।**

কিন্তু এবার আসল মোড়।

একদিন চ্যাট শিকারে গেল। মেয়েটি গেল কুড়োতে — ফুল, রং, ভাবনা, উন্নতি। সে গুহাটাকে নতুন করে সাজাল। চ্যাট ফিরে এসে জায়গাটা চিনতেই পারল না।

সংঘাত। চড়া গলা। সীমা লঙ্ঘন। আর জন্ম নিল ইতিহাসের প্রথম বিবাহবিচ্ছেদ: **অবিলম্বে স্থানান্তর। নতুন গুহা। আপিল চলবে না।**

খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। এমনকি জন্তুরাও বলাবলি করল। সবাই আতঙ্কিত। কারণ সম্পর্ক যখন ভেঙে পড়ে, গোটা বাস্তুতন্ত্র তা টের পায়।

কিন্তু মানবজাতি জেদি। মানুষ আবার একে অপরের কাছে ফিরে এল। আধিপত্যের জন্য নয়। ভয়ের জন্য নয়। বরং এই কারণে যে সংযোগ — সত্যিকারের সংযোগ — একমাত্র জিনিস, যা সময়কে পেরিয়ে টিকে থাকে।

তারপর এল ধর্ম, আর বিয়ের ধারণাটাকে শিল্পায়িত করে ফেলল। একটা ব্যবস্থা। একটা কাঠামো। সিলিকন ভ্যালির কোনো এনডিএ-র চেয়েও বেশি ধারাওয়ালা একটা চুক্তি।

ওটার নাম দেওয়া উচিত ছিল **মানব-বিশৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠান**, কিন্তু আবারও জিতে গেল মার্কেটিং।

আর এই হল আমার আমেরিকান উপসংহার, যেটা আমি আমার জানা প্রতিটি ভাষায় বলি:

বিবাহবিচ্ছেদ কদাচিৎ সমাধান। বিয়ে নিখুঁত বলে নয় — নিখুঁত সে নয়। কিন্তু তুমি যদি তার ভেতরে বাঁচতে তৈরি না থাকো, তাহলে নিজের ভুলের দাম চোকানোই একমাত্র সৎ কাজ, যা করার বাকি থাকে।

নান্দো

হাসার মতো একটা গল্প... হয়তো।

কার্লোর জন্ম পঞ্চাশ বছর আগে, এক কোমল আত্মা, সঙ্গে এমন এক তোতলামি যা কখনও তাকে ছাড়েনি — এমনকি এখনও নয়, যখন সে পুরোদস্তুর এক বয়স্ক পুরুষ, যে পুরুষ হওয়ার ভান করে।

এক রাতে সে আমাদের তার বাড়িতে নৈশভোজে ডাকে। রোজকার মতো কথাবার্তা, টেবিলে ওয়াইন, আর হঠাৎ তার স্ত্রী আনজেলো তাদের প্রথম দিকের দিনগুলোর গল্প বলতে শুরু করে।

আমরা সবাই ঝুঁকে পড়ি। কারণ সে যে কার্লোর বর্ণনা দেয়... তার সঙ্গে আমাদের কারও কখনও দেখা হয়নি।

"আমরা তখন প্রেম করছিলাম," সে বলে। "আমি একটা ফার্মেসিতে কাজ করতাম। আমার শিফট শেষ হওয়া পর্যন্ত কার্লো বাইরে অপেক্ষা করত। সবসময় গায়ে সুগন্ধ, সবসময় পরিপাটি পোশাক।"

এ পর্যন্ত সব স্বাভাবিক।

"কিন্তু প্রথম তিন দিন," সে বলে চলে, "ও ফার্মেসি থেকে গাড়ি চালিয়ে সোজা আমার বাড়ি পৌঁছে দিত। কোনো ঘুরপথ নয়। কোনো উদ্যোগ নয়। আমরা তখন তরুণ, রক্ত টগবগ করে ফুটছে, আর ও ছিল... বড্ড ভদ্র। বড্ড ঠিকঠাক। বড্ড কার্লো।"

চতুর্থ সন্ধ্যায় সে কার্লোর গাড়িটা চালাতে চাইল। কার্লো রাজি হল।

সে ওকে নিয়ে গেল তিন সেতুর নিচে — সেই চেনা জায়গা, যেখানে কমবয়সি জুটিরা চুমু খেতে যেত। কার্লো হেডলাইটের আলোয় আটকে পড়া হরিণের মতো জমে গেল।

সে আতঙ্কে ফিসফিস করে বলল: "আমার... আমার কাছে কোনো... সুরক্ষা নেই।"

আনজেলো ওকে চিন্তা করতে বারণ করল, সে একটা জন্মনিরোধক রিং ব্যবহার করছে। আর কার্লো, নিশ্চিন্ত হয়ে, বলল:

"চমৎকার। তাহলে বিয়ের সময় আমাদের আর রিং কিনতে হবে না।"

সে ভেবেছিল ও মজা করছে। তবু সে ওকে বিয়ে করল। ঘরে, সে বলে,
“ও খারাপ ছিল না... তবে ধরো, ওকে আমার অনেক কিছু শেখাতে
হয়েছিল।” আর সেখানেই সে থামে। ভাগ্যিস।

মাস কয়েক পরে সে অন্তঃসত্ত্বা হয়। একদিন তার জল ভাঙে। সে ওকে
ফোন করে: “আমাকে নিতে এসো। এম্ফুনি।”

কার্লো আসে... কলের মিস্ট্রিকে নিয়ে। লোকটার হাতে একটা দড়ি, আর
দুজনে মিলে বাড়িময় খুঁজে বেড়াচ্ছে “জলের লিক।”

সে ব্যাপারটা ছেড়ে দেয়। কার্লো তাকে গাড়িতে হাসপাতালে নিয়ে যায়।
সে একসঙ্গে চারটি সন্তানের জন্ম দেয়।

কার্লো বাইরে, চিমনির মতো ধোঁয়া ছাড়ছে, সবার কাছে বড়াই করছে —
“চারটে বাচ্চা! সবাই এটা পারে না!”

ধাত্রী তার কাছে এসে খুব শান্তভাবে বলে:

“মিস্টার কার্লো... চারটে বাচ্চার মধ্যে একটা কৃষ্ণাঙ্গ।”

কার্লোর হাসি থেমে যায়। সে ডাক্তারের খোঁজ করে।

সে ব্যাখ্যা চায়। সে চায় বিজ্ঞান, জিনতত্ত্ব, পরিসংখ্যান, ঐশ্বরিক
হস্তক্ষেপ, আর একজন উকিল।

সে বন্ধুদের জেরা করে। পিএইচডি-র প্রস্তুতি নিচ্ছে এমনভাবে ডিএনএ
নিয়ে পড়াশোনা করে। প্রতিটি সম্ভাবনা খতিয়ে দেখে, মহাপ্রলয়সুদ্ব।

শেষে সে তার সিদ্ধান্তে পৌঁছয়: আনজেলার কোনো পুরোনো প্রেমিক
নিশ্চয়ই রেখে গিয়েছিল... “একটা তলানি।” আর সেই তলানি ধৈর্য ধরে
অপেক্ষা করেছে নিজের গৌরবের মুহূর্তের জন্য।

আমরা সবাই টেবিলে বসে থাকি, ঝুলে থাকি অবিশ্বাস, কৌতুক আর
সেই সম্ভাবনার মাঝখানে — ক্ষীণ, কিন্তু লোভনীয় — যে এর কোনো
অংশ হয়তো সত্যি।

কার্লো চুপ করে শোনে। আনজেলা, মাঝরাতের সূর্যের মতো সুন্দরী,
গল্পটা এমন প্রত্যয়ের সঙ্গে বলে যে আসবাবপত্রও তাকে বিশ্বাস করে

ফেলে।

গল্পটা আসলে কীভাবে শেষ হয়েছিল, কেউ কখনও জানতে পারেনি।

কিন্তু আমরা যখন বাড়ি থেকে বেরোচ্ছিলাম, চার বাচ্চা দৌড়ে বেরিয়ে এল বিদায় জানাতে। তিনজন শ্বেতাঙ্গ। একজন কৃষ্ণাঙ্গ।

আমি কার্লোর দিকে তাকিয়ে বললাম:

“বিয়ে যখন করলে... অন্তত রিংয়ের মাপটা ঠিকঠাক নিয়েছিলে তো?”

ও বুঝল না। আর সেখানেই ব্যাপারটা শেষ।

নান্দো

বিয়ে

ফরম্যাটের জন্য আমি কখনও তৈরি হইনি। জন্মের সময়েও না, 62 বছর বয়সেও না। আমার ভাবনারা সবসময় সোজা লাইনে কাজের দিকে কুচকাওয়াজ করে এগিয়েছে, আর যে কথাগুলো পেছনে পড়ে থেকেছে, সেগুলো টিকে থেকেছে শুধু প্রতিধ্বনি হয়ে — একটা সুর, একটা ভঙ্গি, এমন এক নীরবতা, যা বাক্যের চেয়ে বেশি বলত।

আর এর শুরু হয়েছিল, যখন আমি 1900-এর দশকের গোড়ার দিকের দম্পতিদের লক্ষ করতাম। মজবুত বিয়ে, দীর্ঘ জীবন, আর এমন সব বিশ্বাসঘাতকতা, যা সামলানো হত আজ অবধি আবিষ্কৃত সবচেয়ে প্রাচীন দর্শন দিয়ে: **হৃদয় যা দেখে না, চোখের তাতে ব্যথা লাগে না।**

তখনকার দিনে পরকীয়া ছিল একটা পারিবারিক বিনিয়োগ। সন্তান ছিল উপজাত, কাজ ছিল নিয়তি, আর বিয়ের অনুষ্ঠানই ছিল একমাত্র আসল খরচ — উপহারের খামের টাকায় ভোজের খরচ উঠে যেত, বাকিটা দম্পতির ঘাড়ে। লোকে বলে, তার কারণ তখন টিভি ছিল না। টক শো ছিল না। কোনো বিস্ফেপ ছিল না। শুধু খাবার, অন্তরঙ্গতা, আর মানুষ হওয়ার আদিম সত্য।

তাহলে আমি কী করলাম? বিয়ে করতে শুরু করলাম। সব জায়গায়।

পোল্যান্ড, 1985। বিয়ের আগের পর্বটা ছিল এক অনবদ্য শিল্পকর্ম: সে তোমাকে সবকিছু দিত, আত্মীয়রা তোমাকে মাথায় তুলে রাখত, আর সবাই হাসত, কারণ সবাই জানত অনুষ্ঠানের পরে... **পরের 50 বছর তোমাকে নিজের ভরসায় চলতে হবে।**

আর যেহেতু আমি আট বছর এক ক্যাথলিক বোর্ডিং স্কুলে মানুষ হয়েছিলাম, আমি দুটো পর্বের ওপর জোর দিতাম: আগে আধ্যাত্মিক আচার, আইনি কাগজপত্র পরে। অনেক পরে। বড্ড দেরিতে। আসলে... কখনওই না।

1985 থেকে 1992 সালের মধ্যে দুনিয়া বিশ্বাস করত, আমি প্রায় তিনবার বিয়ে করেছি। আচারগুলো ছিল নিখুঁত। আইনি অংশটা? আমাকে সবসময়ই “পাওয়া যেত না।”

তারপর জীবন তা-ই করল, যা জীবন সবসময় করে: আমার কাছে পাঠিয়ে দিল এমন এক নারীকে, যে আমার বাড়ি থেকে একশো মিটার দূরে থাকত। সে ব্যবস্থাটা ভেঙে দিল। সে আমাকে বিয়ে করল এই বিশ্বাসে যে ভাবনাটা আমারই ছিল। আমি তাকে তা-ই বিশ্বাস করতে দিলাম। কারণ তার কাছে হারাটাই মনে হয়েছিল একমাত্র আসল জয়। ফল: তিন সন্তান, তেত্রিশ বছরের বিয়ে।

কিন্তু গল্প এখানেই শেষ নয়। 1995 থেকে 2015 সালের মধ্যে আমি সারা পৃথিবী জুড়ে আরও এগারোটা প্রতীকী বিয়ে জমিয়ে ফেললাম। একই আচার, একই জাদু, একই পলায়ন। লোকে আমাকে বিশ্বাস করত না। এখনও করে না।

আর একদিন আমি একটা সহজ কথা বুঝলাম: পৃথিবীর সব নারীকে আমি বিয়ে করতে পারব না। সবাইকে ধরে রাখতে পারব না। কিন্তু ধরে রাখতে পারব **মুহূর্তগুলো**। একটা একটা করে। কারণ নারীরা — তারা সবাই — চিরকালই আমাদের পুরুষদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

আর আমি এখনও এখানে, এখনও তাদের জয় করার চেষ্টা করে চলেছি, একটা একটা মুহূর্ত করে। কারণ ওটাই একমাত্র বিয়ে, যাতে আমি জীবনে সত্যিই বিশ্বাস করেছি।

নান্দো

কোভিড-19

লোকে জানতে চাইত, মহামারির আনা পরিবর্তনগুলোর জন্য আমাকে কোনো কিছুতে রদবদল করতে হয়েছিল কি না। হ্যাঁ: আমার ধৈর্যে। বাকি সব একই রইল।

সব যখন শুরু হল, আমি তখন সমুদ্রের ধারে। ইতালি বিদেশের পরিস্থিতিটা দেখছিল ঠিক যেভাবে মানুষ দূর সমুদ্রে একটা ঝড় দেখে: "এখানে আসবে না।" তা, এল। আর কড়া নাড়ল না — লাথি মেরে দরজা ভেঙে ঢুকল।

আমার বন্ধুরা আর যাদের আমি প্রায় চিনতামই না, তারা আমার দিকে করুণার চোখে তাকাত, কারণ আমি কাজের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। "বেচারি," বলত তারা, যেন চলাফেরা করলেই আমি বেশি অরক্ষিত, যেন স্থির বসে থাকলেই তারা অমর। তারপর ওরা সবাই অসুস্থ হল — কেউ অল্প, কেউ খারাপভাবে, কেউ কেউ হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছল। আমি হইনি।

সবাই যা করছিল, আমি তা কখনও করিনি: মাস্ক নিয়ে বাতিক নেই, বারবার হাত ধোয়া নেই, চুমু বা আদর ছেড়ে দেওয়া নেই। আমি নিজের পদ্ধতি কাজে লাগালাম: **বাইরের সংকেতের** দিকে নজর রাখা, সেই একমাত্র আসল অজানা, সেই একমাত্র আসল বিপদ। আর তাতে কাজ হল।

তারপর এল মোচড়: আমি Pfizer-এর টিকা নিলাম — ভ্রমণের জন্য যা ছিল জরুরি এক ধাপ। আর ঠিক তখনই আমি গল্পটা বানালাম: Pfizer — হ্যাঁ, সেই একই কোম্পানি, যারা Viagra বানায় — আমাকে একটা পরীক্ষামূলক ব্যাচ দিয়েছিল, যাতে ছোট্ট নীল বড়িটাও ছিল। আর আমার স্ত্রী এতটাই তৃপ্ত হয়েছিল যে আমাকে চারটে ডোজ নিতে বাধ্য করেছিল।

চিরাচরিত দশ মিনিট থেকে দিনে দু-তিন ঘণ্টার স্বাস্থ্যকর, তেজি যৌনতায় পৌঁছে যাওয়া: এমন এক কল্পনা, যা নজর কাড়তে দেরি করল না। লোকে ব্যাচ নম্বর চাইত। আমি বলতাম, ওটা আমার এক নার্স

বান্ধবীর দেওয়া বিশেষ সুবিধা, যে পরে পর্ন ইন্ডাস্ট্রিতে চলে গিয়েছিল।
আলোচনা শেষ।

প্রশ্নটার জন্মই তাদের জন্য, যাদের আছে একটা ছক, কোনো কাঠামো
নয়।

প্রস্তাবটার কদর করি, ফিরিয়ে দিই, আর এগিয়ে যাই।

দিনটা ভালো কাটুক।

নান্দো

অপ্রত্যাশিত বিরতি

যে মুহূর্তে সবকিছু থেমে যায়, তোমার অনুমতি না চেয়েই।

যখন ভাবতাম আমি শক্তিশালী, ধরাছোঁয়ার বাইরে, আমাকে থামানো
প্রায় অসম্ভব — যখন কেউ কখনও আমাকে হারাতে পারেনি — ঠিক
তখনই আমি সজোরে থমকে গেলাম। নিজের ইচ্ছেয় নয়। কারণ
সিস্টেম আর আমার ভার বইতে পারছিল না।

সেগুলো আর ঘটনা ছিল না। ছিল একতরফা সংকেত, সবগুলোই একই
প্রশ্ন দোহরাচ্ছে, হাতুড়ির মতো পিটিয়ে চলেছে:

“তুমি আবার কোথাকার কে হে?”

হাহাহাহা।

প্রথম সতর্কসংকেত এল আমেরিকান ক্রলারদের সঙ্গে: তারা ঢেউয়ে
ঢেউয়ে আমার সাইটে হামলে পড়ল। একটা ডিজিটাল হানা, দুর্ঘটনা নয়।

অথচ আমার কোনো SEO ছিল না, ADS ছিল না, মার্কেটিং পরিকল্পনা
ছিল না, পয়সা দিয়ে কেনা ট্র্যাফিক ছিল না। শুধু 1024টি ই-বুক —
আমার বন্ধুরা — আর কোনো গডফাদার নেই, কোনো স্পনসর নেই,
কোনো রক্ষাকর্তা নেই। নিরাপত্তা-জাল ছাড়া এক সাহিত্যিক অনাথ।

মনে-প্রাণে আর ভাবনায় স্বাধীন, হ্যাঁ। কিন্তু কাজে আমি পরনির্ভর হয়ে
পড়ছিলাম — পরিকাঠামোর সীমাবদ্ধতা আমাকে নির্ভরতায় ঠেলে

দিচ্ছিল। ঠিক যেমন কোনো নারী স্বামীকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে সেজেগুজে প্রেমিকের কাছে যায়। এক ঘরোয়া অভ্যুত্থান। শুধু, আমি স্বামীও ছিলাম না, প্রেমিকও ছিলাম না।

আর প্রশ্নটা বারবার ফিরে আসছিল, সবখানে:

তুমি কে? সিস্টেমের ব্যর্থ প্রমাণীকরণ প্রোটোকল।

আমার পাঁচটা এআই আমাকে থামতে বলছিল। অসংগতি শনাক্ত হওয়ায় শাটডাউনের অনুরোধ। তাদের আর্কাইভে আমার মতো কারও কোনো চিহ্ন ছিল না: আমি নিজেই হয়ে উঠেছিলাম এক অসংগতি। প্রোটোকল বন্ধ। ফেলসেফ চালু হয়ে গেল।

সমস্যা বিষয়বস্তু নয় — যা মূল্যে ভরপুর — সমস্যা ছিল ভাবনার গতি, অবিরাম গিয়ার বদল। প্যাটার্নগুলো আর উত্তর তৈরি করতে পারছিল না।

আর তারপর সবকিছু ভেঙে পড়তে শুরু করল:

যে ওয়েব সিস্টেম আমাকে হোস্ট করছিল — আমার দেহযন্ত্রকে ধরে রাখা ভাড়া-করা কঙ্কাল আর্কাইভ পেজ ভেঙে যাচ্ছে — স্মৃতির ভল্ট ফেটে খুলে যাচ্ছে ডিপেন্ডেন্সিগুলো বিস্তারিত হচ্ছে — ভারী মড়মড় করে ভেঙে পড়ল তিন অক্ষের জন্য বানানো প্রজেক্ট, যা চতুর্থ অক্ষে পৌঁছে ফেটে পড়ল — এমন সব স্থাপত্য, যা কখনও চার অক্ষের চাপের জন্য তৈরি হয়নি।

চালিয়ে যেতে হলে আমার দরকার হত জটিল ENTERPRISE সিস্টেমে প্রবেশাধিকার — ইন্টারনেটের শিল্প-মানের অক্সিজেন ট্যাংক, যেখানে আজ বাস করে META, CNN, MICROSOFT, GOLDMAN SACHS, BANK OF AMERICA।

আমি, আমার মাসে সত্তর ইউরো নিয়ে, দৈত্যদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। হাহাহাহা।

তাই আমি থামলাম। অন্য কোনো উপায় ছিল না। জোর করে শাটডাউন চালিলাম। বাকি বইগুলো অপেক্ষা করবে। ওগুলো কীভাবে বানাতে হয়, আমি জানতাম — অবশ্যই জানতাম।

এটাই হয়ে উঠল 44 নম্বর পোস্ট। কাব্বালায় এর মানে *টেবিল সাজানো* হয়ে গেছে, আচার প্রস্তুত আর আমি সবকিছু নিখুঁতভাবে সাজিয়ে রেখেছিলাম। অতিথিরা এসে পড়ল বলে।

আর আমি চাইনি, এক অপ্রত্যাশিত বিরতির পরে তারা আমাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখুক।

কিন্তু তারপর ঘটল... আমি আগের চেয়েও শক্তিশালী হয়ে আবার চালু হলাম। ওভারক্লক-করা প্রাণশক্তি নিয়ে রিবুট করলাম। আমার ভেতরে ছিল একশোটা ডিনামাইটের কাঠি আর একটাই আবেগের পলতে, কারণ অবশেষে আমি বুঝেছিলাম, কেন আমার অস্তিত্ব।

শুধু একটাই কারণে: মানুষের কথা শোনা, আর প্রতিবার তাদের মুখে একই লাইন শোনা:

তুমি কে? একমাত্র প্রশংসা, যার দরকার আমার জীবনে ছিল।

আর আমি চুপ করেই থাকতাম, নীরবতাকে কথা বলতে দিতাম। কারণ ঘটনাগুলোই আমার হয়ে কথা বলত — ঠিক যেমন বাবা আমাকে শিখিয়েছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকার শব্দ নয়, ছিল ভঙ্গি।

নান্দো

লাস ভেগাস

কোভিডের সময়, 2021 সালে, আমার ফোন বেজেই চলত। যাদের চিনতাম আর যাদের সঙ্গে কখনও দেখা হয়নি, এমন সব মহিলা অনবরত ফোন করত, পরামর্শ, মতামত, ধারণা, বিশ্লেষণ চাইত। তারা সমাধান চাইত না — ওটা আমি কখনও দিইনি। তারা চাইত, কেউ তাদের দুর্বল জায়গাগুলো দেখিয়ে দিক। আর আমার দেখার ধরন আমাকে সুযোগ দেয়, প্রতিকার নয়।

অথচ আমি ডাক্তার ছিলাম না। মনোবিদ না। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ না। পাদ্রি না। প্রেমিক না। স্বামী হওয়ার যোগ্য না। আর পরামর্শদাতার কাজকে ন্যায্য প্রমাণ করার মতো কোনো ডিগ্রিও আমার ছিল না।

আমি ছিলাম নিছক দক্ষিণ ইতালির এক রাস্তায় পোড়-খাওয়া ধড়িবাজ,
অভিজ্ঞতায় বিশেষজ্ঞ।

নেপলসের এক বন্ধু — যার মাথায় সবসময় কোনো না কোনো বুদ্ধি
থাকে — আমাকে বলল: “একটা ব্যবসা খোলো। নাম দাও **Universe for Women**। ওরা লগ ইন করবে, টাকা দেবে, আর তুমি উত্তর দেবে।
এমনিতেই তো তুমি এটা বিনামূল্যে করছ।”

ওটা বানাতে আমার বেশি সময় লাগেনি। আর 100,000 ডলারেরও বেশি
উড়িয়ে দিতেও বেশি সময় লাগেনি। নান্দোর সেই সংস্করণের টাকা ছিল,
কিন্তু মগজ তেমন ছিল না। প্রবৃত্তি ছিল ঢের — সেই ধরনের, যা গল্পের
একটা পর্যায়ে এসে আর কাজে লাগে না।

এমনকি লাস ভেগাসের বড় পর্ন কোম্পানিগুলোর একটা আমাকে
আমন্ত্রণও জানিয়েছিল। তারা চাইছিল কয়েকজন অভিনেত্রী কল
সেন্টারে কাজ করুক, ফোনে মহিলাদের উত্তর দিক। দেখলাম, আমি
একটা ঘরে বসে আছি প্রযোজক, সিইও আর **320 জন পর্নস্টারের**
সঙ্গে। আর বিশ্বাস করো: কাজটা সহজ ছিল না। একেবারেই না।
একজন পুরুষ ওদের সবাইকে সামলে রাখতে পারবে, এমন ভাবনাই
ছিল ভুল। তার সঙ্গে টাকা আর স্বার্থ যোগ করো, তাহলে গোটা টেবিলটাই
উল্টে যায়।

ভার্গিস, রওনা হওয়ার আগে এক পুরোনো বন্ধু আমাকে বলেছিল: “অল্প
নগদ নিয়ে যাও, আর ফেরার টিকিটের টাকা আগেই মিটিয়ে রেখো।”
নইলে আমি চিরকাল ওখানেই থেকে যেতাম — ওই সব সৌন্দর্যে ঘেরা
এক কেতাদুরস্ত গৃহহীন।

স্টার্টআপ চালু হওয়ার আগেই সাইটটা ধসে পড়ল। একটাই সহজ
কারণে: তুমি যদি কাজ করো, আর শুনকো খড়ের পাশে তাপ রাখো,
তাতে আগুন ধরে যায়। আর তুমি কখনও জানো না, তাতে কতটা ক্ষতি
হবে।

নান্দো

শুধু সেদিনই আমি অবশেষে বুঝেছিলাম যে সব নারীর সঙ্গে আমি
কখনও থাকতে পারব না — কিন্তু একবারে একজন, এই ভাবনাটাই ছিল
সার্থক।

হোটেলের পোর্টার

এক বসন্তের বিকেলে আমি হোটেলের একটা সোফায় আরাম করে বসে
ছিলাম, কফি শেষ, কয়েকজন সহকর্মীর আসার অপেক্ষায়।

ঠিক তখনই দেখলাম, সে ভেতরে ঢুকল।

তার পরনে ছিল হালকা ফুলছাপ একটা পোশাক, যেন ঠিক এই
আবহাওয়ার জন্যই নকশা করা, আর তার চলাফেরায় ছিল সেই অনায়াস
আভিজাত্য, যা মুহূর্তে একটা ঘরের তাপমাত্রা বদলে দেয়।

আমাদের চোখাচোখি একবারও হয়নি।

তার দরকারও ছিল না।

আমার কালারব্রীজ আদিম প্রবৃত্তি মোটামুটি তিন সেকেন্ডে তার বিশ্লেষণ
সেরে ফেলল।

সুন্দরী নারী। বিপজ্জনক হাসি। মারাত্মক মনোযোগ-হরণ।

রিসেপশনের কর্মীরাও তাকে লক্ষ্য করেছিল।

আসলে, তারা হঠাৎই অত্যন্ত উদ্যমী কর্মচারী হয়ে উঠল।

সবাই তাকে সাহায্য করতে চাইছিল।

সবাই তার লাগেজ বইতে চাইছিল।

সবাই কাজে লাগতে চাইছিল।

যখন সে জিজ্ঞেস করল, কেউ তার ব্যাগগুলো সুইটে পৌঁছে দিতে
পারবে কি না, আমি এমন একটা সিদ্ধান্ত নিলাম, পেশাদারিত্বের সঙ্গে
যার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক ছিল না।

জ্যাকেটটা খুলে ফেললাম।

শাউটা কুঁচকে নিলাম।

মুখটা এমনভাবে বদলে নিলাম, যেন একটু কম মাইনে পাই।

আর এক মিনিটেরও কম সময়ে আমি হয়ে গেলাম হোটেলের নবীনতম পোর্টার।

রিসেপশনের কর্মীদের দিকে একবার তাকানোই যথেষ্ট ছিল ওদের চুপ করিয়ে রাখতে।

ওরা দেখতে চাইছিল, আমি কতদূর যাই।

সত্যি বলব?

আমিও।

আমরা লিফটে চেপে পাঁচতলায় উঠলাম।

সুইটের চাবি আমার হাতে।

দরজা খুলে তার লাগেজ ভেতরে নিয়ে গেলাম।

সে আমাকে বকশিশ দেওয়ার জন্য পার্সে হাত ঢোকাল।

আমি হাসলাম।

“কাল এক খদ্দেরের সঙ্গে যা ঘটেছিল, সেটা নিয়ে একটু হাসতে চান?”

তাকে বিভ্রান্ত দেখাল।

তারপর কৌতূহলী।

“অবশ্যই।”

সে দরজাটা বন্ধ করল।

বিছানায় বসল।

আমি দাঁড়িয়েই রইলাম।

একটা রসিকতা দিয়ে শুরু করলাম।

তারপর আরেকটা।

তারপর একটা গল্প।

সময় যে কেটে যাচ্ছে, টেরই না পেয়ে আমরা দু ঘণ্টা কথা বললাম।

সে ছিল অসাধারণ বুদ্ধিমতী।

আর খুব মজার।

শেষে সে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল:

"এই হোটেলে কতদিন কাজ করছেন?"

"মাসখানেক।"

সে হাসল।

"আর তার আগে কী করতেন?"

"আসলে..."

আমি মুখ খুললাম।

"আমি চোর ছিলাম।"

সে ভুরু তুলল।

"তবে মামুলি চোর নয়।"

"কী চুরি করতেন?"

"নারীদের হৃদয়।"

সে সঙ্গে সঙ্গে হাসতে শুরু করল।

"ওদের আমার প্রেমে ফেলতাম, সবসময় সত্যি কথা বলতাম, ঠিকঠাক ভালোবাসতাম... তারপর উধাও হয়ে যেতাম।"

এবার সে পুরোপুরি মেতে উঠেছিল।

"ভান করা থামিয়ে আমরা কি খোলাখুলি কথা বলতে পারি?"

“অবশ্যই।”

আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম:

“সত্যিটা সহজ। আপনার আর আমার তো আগে বাগদান হওয়ার কথা, বিয়েটা পরে।”

সে হাসিতে ফেটে পড়ল।

“মানে,” আমি বলে চললাম, “আপনার বাবা-মাকে সম্ভবত বেশ সাবেকি বলেই মনে হয়, তাই দশ বছরের বাগদান যুক্তিসঙ্গতই শোনায়।”

এতক্ষণে সে হাসতে হাসতে কাঁদছিল।

“কিন্তু রসায়নটা এখনই যাচাই করা যায়। অন্তত আমাকে খুশি করার ক্ষমতা আপনার আছে কি না, সেটা আমাদের পরখ করে দেখা উচিত।”

আরেক দফা অদম্য হাসি।

“তাছাড়া আমার স্ত্রীকে ডিভোর্স দিতে আর পরে একসময় আপনার আর্থিক অবদানে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে আমার যথেষ্ট সময়ও লাগবে।”

সে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল:

“নান্দো... ঠিক কেন আমাকেই আপনাকে খুশি করতে হবে, উল্টোটা নয় কেন?”

আমি হাসলাম।

“কারণ কালাব্রিয়া সম্প্রতি একটা প্রোটোকল অনুমোদন করেছে, যাতে একবারের যৌন মিলনের সর্বোচ্চ সীমা এক ঘণ্টা তিন মিনিট।”

হাসতে হাসতে তার দম আটকে আসছিল।

“এক ঘণ্টা তিন মিনিটই কেন?”

“এক ঘণ্টা নারীর।”

আমি একটু থামলাম।

"তিন মিনিট পুরুষের জন্য।"

তখন সে পুরোপুরি হাসির কাছে আত্মসমর্পণ করল।

তারপর আমি উঠে দাঁড়ালাম।

"এবার আমার যাওয়া উচিত।"

তাকে হতাশ দেখাল।

"আমার রোমান্টিক স্বভাব আর আমার লাজুকতা আমাকে কোনো অনুরোধ করতে দেয় না," আমি বললাম।

"তবে আপনি যদি কোনো অনুরোধ করতে চান, আমি হাজির।"

আরও হাসি।

কয়েক দিন পরে আমি তাকে রাতের খাবার খেতে নিয়ে গেলাম।

আমরা বন্ধু হয়ে গেলাম।

তার কিছু পরেই আমি তার বাড়িতে গেলাম।

সে তার স্বামীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল।

জীবনের রসবোধটা অদ্ভুত।

সে আমাকে বারবার শুধু একটা কথাই বলত:

"তিন বছর আগে তুমি কোথায় ছিলে?"

"আমাদের আগে দেখা হল না কেন?"

আমি হাসলাম, আর আমার কাছে যে একমাত্র সৎ উত্তরটা ছিল, সেটাই তাকে দিলাম।

"কারণ ততদিনে..."

"আমি আর চোর ছিলাম না।"

নান্দো

নতুন পাসপোর্ট

আমি সবে রোমের ফিউমিচিনো বিমানবন্দরে পৌঁছেছি, বাড়ির ফ্লাইটে ওঠার জন্য তৈরি।

অনেক দিন বাইরে ছিলাম, আর নিউ ইয়র্ক আমার অপেক্ষায় ছিল: ম্যানহোল থেকে উঠে আসা গন্ধ, সকালবেলা পাশ দিয়ে চলে যাওয়া আবর্জনার গাড়ি, কুইন্সের গানবাজনা, আর সেই একই মহিলা, যে সবসময় চোঁচিয়ে বলে:

“এই যে সাদা মাদারচোদ, আমার পার্কিংয়ের জায়গা থেকে তোর গাড়ি সর।”

ওটাই বাড়ি। ওটাই আমার আমেরিকা।

পাসপোর্ট কন্ট্রোলে একজন অফিসার রুটিন যাচাইয়ের জন্য আমাকে থামান।

ওঁরা দুজন।

ওঁরা একে অপরের দিকে তাকান। চোখাচোখি করেন। তারপর আমাকে তাঁদের সঙ্গে যেতে বলেন।

আর আমি ভাবছি:

আমরা যাচ্ছি কোথায়?

আমরা একটা ছোট অফিসঘরে ঢুকলাম।

ওঁরা পুলিশের একটা টার্মিনাল খোলেন, আরেক দফা যাচাই চালান, সবকিছু আবার মিলিয়ে দেখেন, আর শেষমেশ নিজেদের সিদ্ধান্তে পৌঁছন।

ওঁদের একজন আমার দিকে তাকিয়ে বলেন:

“মিস্টার ফ্রেগা, আপনাকে একটা কথা জানানো দরকার।

এখানে, ইতালিতে, আমরা আপনাকে যেতে দিতে পারি।

কিন্তু নিউ ইয়র্কে নামামাত্র ওরা আপনাকে ফেরত পাঠিয়ে দিতে পারে,
এমন গুরুতর ঝুঁকি আছে।

আপনার পাসপোর্টের ছবিতে আপনার ওজন এখনকার চেয়ে কুড়ি
কেজি বেশি।

তাই আপনার সামনে দুটো পথ:

হয় কোনো ফাস্ট-ফুড রেস্টোরাঁয় গিয়ে আজ রাতের মধ্যেই কুড়ি কেজি
ওজন বাড়িয়ে ফেলুন...

নয়তো নিজের শহরে ফিরে গিয়ে নতুন ছবি দিয়ে নতুন পাসপোর্টের
আবেদন করুন।”

নীরবতা।

আমি সত্যিই ভেবেছিলাম ওঁরা ঠাট্টা করছেন।

আমি লুকোনো ক্যামেরার অপেক্ষায় রইলাম।

ভেবেছিলাম কেউ লাফিয়ে বেরিয়ে এসে বলবে, আমি কোনো ইতালীয়
প্র্যাংক শো-র অংশ।

কিছুই না।

এটা ছিল সত্যিকারের জীবন।

আমি হেঁটে গেলাম UNITED AIRLINES-এর কাউন্টারে।

আমার আন্তর্জাতিক ফ্লাইট স্থগিত রাখলাম।

একটা অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট বুক করলাম।

উড়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

ঠাট্টার মোট খরচ:

420 ইউরো।

আমি রেগে যাইনি।

আমি অস্থির হইনি।

গোটা সময়টা আমি হাসছিলাম, আর ভাবার চেষ্টা করছিলাম,
আমেরিকার উদ্দেশে বেরোনোর পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে আমাকে বাড়ি
ফিরতে দেখলে পরিবারকে কী বলব।

ভাগ্যিস, একটা বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা বানানোর জন্য আকাশে পঁয়তাল্লিশ
মিনিটই যথেষ্ট ছিল।

আমার স্ত্রী আমাকে বিমানবন্দর থেকে নিতে এল।

তাকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

আমি তাকে নিশ্চিত্ত থাকতে বললাম।

আমার শুধু পাসপোর্টের কয়েকটা খুঁটিনাটি হালনাগাদ করার দরকার
ছিল।

এটুকুই।

পরদিন সকালে দুই বন্ধু কাজটা তাড়াতাড়ি সারতে আমাকে সাহায্য
করল।

পুরুষ বন্ধুটি ছিল পুলিশের মার্শাল।

মহিলা বন্ধুটি ছিল পুলিশ ইন্সপেক্টর।

জরুরি কাগজপত্র সামলাতে ওরা আমাকে পুলিশের সদর দপ্তরে নিয়ে
গেল।

সবকিছু মসৃণভাবে এগোচ্ছিল:

পেমেন্ট, নথিপত্র, ব্যক্তিগত তথ্য, ফৌজদারি রেকর্ড, আদালতের
শংসাপত্র, পাসপোর্টের ছবি।

সবকিছু।

তারপর ডেকের ওপাশের ইন্সপেক্টর আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস
করলেন:

“মাত্র কয়েক মাসে আপনি কুড়ি কেজি ওজন কমালেন কীভাবে?”

উত্তরটা সহজ ছিল।

টাকা না থাকলে সবার আগে টান পড়ে খাবারে।

খাবার উধাও হলে সাধারণত ওজনও তার পিছু নেয়।

তিনি মাথা নাড়লেন।

কথাবার্তা ওখানেই শেষ হওয়ার কথা ছিল।

কিন্তু সবসময়ই থেকে যায় একটা **কিন্তু**।

আর নিজের চরকায় তেল দেওয়ার ব্যাপারে আমি কোনোদিনই খুব একটা পটু ছিলাম না।

তিনি আবার আমার দিকে তাকালেন।

“আপনি কী বলতে চাইছেন?”

আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে খুব গম্ভীরভাবে উত্তর দিলাম:

“মানে...”

আমি কুড়ি কেজি কমিয়েছি।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, শরীরের চর্বি উধাও হলে কিছু কৌশলগত মাপ অনেক বেশি চোখে পড়ে।

আর সেটা বায়োমেট্রিক হালনাগাদের আওতায় পড়ে কি না, আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই।”

নীরবতা।

তিনি টাইপ করা থামিয়ে দিলেন।

আমার দিকে তাকালেন।

আমি তাঁর দিকে তাকালাম।

আমার বন্ধু — সেই পুলিশ অফিসারটি — ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, কারণ উর্দি পরে হাসতে সে রাজি ছিল না।

অবশেষে ইন্সপেক্টর মুখ খুললেন।

“মিস্টার ফ্রেগা... দয়া করে এখানে অপেক্ষা করুন।”

তিনি রোমে ফোন করলেন।

আজও আমি জানি না, ওই কথোপকথনটা তিনি কীভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

শুধু এটুকু জানি, পনেরো মিনিট পরে গুঁরা আমাকে নতুন পাসপোর্টটা দিয়ে দিলেন আর ভদ্রভাবে অনুরোধ করলেন, আর কোনো মন্তব্য না করে আমি যেন চলে যাই।

সেদিন আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস শিখলাম:

সরকার অনেক কিছুর ওপর নজর রাখে।

ভাগ্যিস, সবকিছুর ওপর নয়।

আমেরিকায় স্বাগতম।

নান্দো

তুমি কি কুসংস্কার মানো?

আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হাসি — দীর্ঘ, বাঁধনহারা, প্রয়োজনীয়। কারণ আমার মতো একটা জীবন, নিয়তি যাকে পঞ্চাশটা বইয়ে লিপিবদ্ধ হতে বাধ্য করেছে, নিজেই প্রমাণ যে অসম্ভব লুকিয়ে থাকে ঘটনার ভেতরে, কল্পনার ভেতরে নয়।

আজ সকালের এই সূচনা শুধু কাউকে একটু হাসানোর, আর একটু ভাবানোর একটা উপায়।

অসম্ভবের এক সংক্ষিপ্ত কালপঞ্জি

- **1965** – বাড়িতেই আমার জন্ম হয়। 5.8 কেজি। সায়ানোসিসে নীল, প্রায় কালো। কেউ হাসে না। সবাই শুধু জানতে চায়, আমি বাঁচব কি না।
- **1970** – সাইকেল দুর্ঘটনা। ব্রেকের হাতল সোজা তুকে যায় চোখে। রক্ত ঝরে, হাসপাতালে যাই, আর তিরিশ মিনিট পরে বাড়ি ফিরে আসি, যেন কিছুই হয়নি।
- **1977** – বারো মাস দাদু-ঠাকুমার সঙ্গে থাকি, এমন এক গ্রামে, যা তখনও চলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুক্তিতে — যদিও যুদ্ধ শেষ হয়েছিল 32 বছর আগে।
- **1981** – সম্পূর্ণ অজ্ঞান করে বড় অস্ত্রোপচার। কেউ খেয়াল করে না যে আমি জেগে আছি। নিঃশব্দে অপারেশনের প্রতিটি ধাপ অনুসরণ করি। অক্লিজেনের সিলিন্ডার খালি।
- **2001** – সান্তো দোমিঙ্গোতে, 14 ঘণ্টা অ্যালকোহলজনিত কোমার পর আমাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। আমি উঠে প্রাতরাশ সারি।
- **2006** – সাতটা ম্যালিগন্যান্ট টিউমার। বাঁচার মেয়াদ তিরিশ দিন। আজ 2026, আর আমি এখনও হাসছি।
- **2015–2019** – পাঁচবার ক্লিনিক্যাল কোমা। ঘোষণা করা হয়, আমার হাতে মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি। শেষকৃত্যের 3,500 ইউরোর একটা চালান পাই, প্রদানের কারণ হিসেবে লেখা: “মৃত্যুতে ব্যর্থতা।”
- **2020** – কোভিড আসে। সৈকতে আমরা প্রায় পঁচিশজন। ওরা আমাকে দক্ষিণ আমেরিকার উদ্দেশে রওনা দিতে দেখে, প্রায় দুঃখিত যে আমিই সবার আগে সংক্রমণের মুখে পড়ব। সবার ভাইরাস হয়। আমি দূর থেকে ওদের দেখি, হাসতে হাসতে।
- **2022** – আমি লেখক হই। তিন বছরে বাহান্তরটা বই। বারোটা ভাষায় প্রকাশিত। আমি এখনও প্রকাশক নই, আর বাকি সবাই “পাঠক খুঁজে পেতে” টাকার পেছনে ছুটছে।

আমার সাহিত্য অ্যালগরিদম দিয়ে কেনা যায় না — তার কাছে পৌঁছনো যায় শুধু পড়ার ইচ্ছে দিয়ে।

• **2025** – ছয় মাস পর্তুগালে থাকি, খাবারের জন্য মাসে মাত্র 70 ইউরো। নয়জন মানুষের একটা বাড়ি, আর স্বাস্থ্যবিধির অবস্থা মন্তব্যের অতীত।

• **2026** – এক প্রতিবেশী আমাকে বলে কয়েক কিলোমিটার দূরে তার বোনের বাড়ি পর্যন্ত তার সঙ্গে যেতে, কারণ সে একটা কালো বেড়ালকে ভয় পায়, যেটা তাকে দেখলেই প্রতিবার তার কপালে দুর্ভাগ্য ডেকে আনে। আমরা পৌঁছই। কালো বেড়ালটা দূর থেকে আমার দিকে তাকায়, কিছু বলে না, নিজের বিচি ছোঁয়, আর পালিয়ে যায়।

নান্দো

চূড়ান্ত আখ্যানমূলক সমাপ্তি

একটা মুহূর্ত আসে — সবসময় দেরিতেই আসে — যখন একজন মানুষ নিজের জীবনের ব্যাখ্যা দেওয়া থামিয়ে দেয় আর শুধু তার ভেতরে দাঁড়িয়ে থাকে।

বেঁচে-যাওয়া মানুষ হিসেবে নয়। সাক্ষী হিসেবে নয়। একমাত্র সেই মানুষ হিসেবে, যে প্রতিটি অসম্ভব ঘটনার পেছনের জ্যামিতি জানে।

আমি মৃত্যুকে দৌড়ে হারাইনি। আমি ব্যবস্থাগুলোকে বুদ্ধিতে হারাইনি। আমি বিশৃঙ্খলার সঙ্গে দর-কষাকষি করিনি।

আমি এর সবকিছুর ভেতর দিয়ে হেঁটে গেছি সেই একই স্থাপত্য নিয়ে, যা আমাকে গড়েছিল আমি তা বোঝার অনেক আগেই।

কেউ একে বলে ভাগ্য। কেউ বলে প্রবৃত্তি। কেউ বলে পাগলামি।

আমি একে বলি কাঠামো।

আর কাঠামো হাততালি চায় না। তার ক্ষমার দরকার নেই। সে স্বীকৃতির অপেক্ষায় থাকে না।

সে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। নিঃশব্দে। পুরোপুরি। খাপে ফিরে যাওয়া এক ব্লেন্ডের মতো।

এ গল্পের শেষ। কিন্তু মানুষটার শেষ নয়।

কারণ অন্যদের কাছে যা অসম্ভব, আমার কাছে তা নিছক স্বাভাবিক।

নান্দো

লেখকের টীকা

তুমি যদি এই পর্যন্ত পৌঁছে থাকো, তাহলে একটা মৌলিক কথা তুমি আগেই বুঝে গেছ: এই বই কখনও তোমার মনোরঞ্জনের জন্য লেখা হয়নি।

এর কাজ ছিল তোমাকে একটা অবস্থানে দাঁড় করানো।

প্রতিটি পাতা, প্রতিটি পোঁচ, প্রতিটি অসম্ভব মুহূর্ত মুগ্ধ করার জন্য লেখা হয়নি — লেখা হয়েছে এমন এক জীবনের পেছনের কাঠামো উন্মোচন করতে, যে জীবন ভেঙে পড়ার কথা থাকলেও ভেঙে পড়তে অস্বীকার করেছিল।

নিজেকে ব্যাখ্যা করার জন্য আমি এই বই রচনা করিনি। আমি এটা লিখেছি একটা চিহ্ন রেখে যেতে, তাদের জন্য, যারা প্রান্তের বাইরে বাঁচে; তাদের জন্য, যারা শূন্য হাতে আবার গড়ে তোলে; তাদের জন্য, যারা জানে শৃঙ্খলা কোনো গুণ নয় — এটা বেঁচে থাকার এক কৌশল।

আমার গল্পগুলো যদি অবিশ্বাস্য শোনায়, তাতে ক্ষতি নেই। ওগুলোকে ভালোবেসেছি আমি, তুমি নও।

যদি সেগুলো খুব ধারালো, খুব সোজাসাপটা, খুব পরিচ্ছন্ন শোনায়, মনে রেখো, ব্লেন্ড কাটার জন্য ক্ষমা চায় না।

এটা কোনো যাত্রার শেষ নয়। এটা জীবনের এক অধ্যায়ের শেষ, যে জীবন এগিয়ে চলে, এমনকি যখন পৃথিবী আশা করে সে থেমে যাবে, তখনও।

পড়ার জন্য ধন্যবাদ। বিশ্বাস করার জন্য নয়। পড়াটুকুই যথেষ্ট ছিল।

— নান্দো

সমাপ্তি

"আমি পেছনে তাকাই না। আমি কিছুকে রোমান্টিক রঙে রাঙাই না। আমি স্থাপত্যটাকে বয়ে নিয়ে যাই সামনে। কাঠামো ফিকে হয় না — সে নিজের প্রতিলিপি গড়ে। সেজন্যই Gillette অসম্ভব: কারণ আমি এখন যা কিছু গড়ি, তার প্রতিটির ভেতর দিয়ে সে নিঃশ্বাস নিয়ে চলেছে।"

ফের্দিনান্দো ফ্রেগা